# ধূসর নীল ভোরের নৌকো

February 24, 2022 0 Comments

উপন্যাস

অমর মিত্র

বাজার থেকে বাড়ি ফিরে ললিত শুনল, আবার একটা ঢেউ আসছে।

কণিকার খবর। বাড়ি বসেই খবর পায় কণিকা। ইউটিউব, ইন্টারনেটের ওয়েব পোর্টাল, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ তার খবরের উৎস।

তা ব্যতীত টেলিফোন তো আছেই। বিকেলে খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ে কণিকা। ঢেউয়ের পরে ঢেউ আসছে। প্রথম ঢেউয়ে বেসামাল হয়েছে সারাবিশ্ব। তা কমতির দিকে এখন। মানুষজন ভাবছে, মহামারি বিদায় নিচ্ছে। কেউ পরিবার নিয়ে পাহাড়ে ছুটছে, সমুদ্রে ছুটছে। মহামারিতে দম বন্ধ হয়ে আসা মানুষ এসব করে শ্বাস নিতে চাইছে। ললিত কয়েকবার কণিকাকে বলেছে, কোথাও একটা গেলে হয়। টাকিতে ইছামতী নদীর ধারে। কিংবা অযোধ্যা পাহাড়ে, পুরুলিয়ায়। বিষ্ণুপুরের মন্দির দেখে আসে আবার। পাঁচমুড়ায় গিয়ে হাতি-ঘোড়া কিনে আনে। যাবে যাবে ভাবছে ললিত, তাকে ঠেকিয়ে রাখছে কণিকা, আর একটু কমুক। তুমি আমি দুজনে। একজনের যদি কোভিড হয়ে যায় এই বয়সে, তখন কী হবে? ললিতের মনে হয়, কণিকার ভয় অমূলক। কমে গেছে মহামারি। ভাইরাস দুর্বল হয়ে পড়েছে। এরই ভেতর বাড়ি বসে বসে কী খবর পেল কণিকা?

ললিত বলল, ওসব ফালতু কথা, মহামারি চলে যাওয়ার সময় হয়েছে, সুইডেনের এক বিজ্ঞানী বলেছে।

কালি ও কলম

যে যেমন পারে বলে যাচ্ছে, কী হবে কেউ জানে না। ললিত বিড়বিড় করে বলল।

তারা দুজনে কথা বললেই কথা হয়। বাতাসে ঢেউ ওঠে শব্দের। তা বাদে বাড়ি প্রায় নিঝুম। একতলার সব ঘর তালাবন্ধ। একটি খোলা আছে। সেখানে রান্নার মেয়েটি থাকে। এখন সে আর মেয়ে নেই। বুড়ি। এই বাড়িতে এসেছিল যখন বছর বাইশ। বিয়ে হয়েছিল। স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছে। বসিরহাটের দিকে বাড়ি। সে আশ্রয় পেয়েছিল ললিতের বাড়িতে। না আশ্রয় নয়, বহাল হয়েছিল। তারপর থেকে রয়েই গেছে। বিয়ের পর একটি সন্তান হয়েছিল অশ্রুর। কয়েক মাস বেঁচে মরে গিয়েছিল। তারপরও মাস তিন সংসার করেছিল। সেসব অনেক গল্প। চেনা কাহিনি। অশ্রু এই বাড়িতে কাজ করতে আসে বাড়ি ছেড়ে। ভাইয়ের সংসারে গলগ্রহ হয়ে

থাকবে কেন? থাকা যেতও না। তারা ঠেলছিল দুর্বৃত্ত স্বামীর ঘরে। অশ্রু ভ্যাকসিন নেয়নি। তার ভয় করে। সুঁই ফোটাতে তার খুবই ভয়। তারপর জ্বর আসবে। ললিত তাকে বুঝিয়েছে খুব। কিন্তু সে অনড়। বাজারঘাট করে ললিতই। আর আছে বাড়ি পরিষ্কার, বাসন মাজার জন্য এক মুসলমান বউ। রুকসানা বিবি। সে-ও এটা-ওটা এনে দেয়। ললিত সবদিনই মাস্ক পরে বেরোয়। বেরোতে তার ভালো লাগে। সকালের রোদ লাগাতেও বেরোয়। হেঁটে আসে। দেখছে, সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে, একটা লোক, ললিত তাকে মুখে চেনে কিন্তু নাম জানে না, ললিতকে বাজারেই বলল, কলেজ স্ট্রিট খুলেছে, সে তার দোকান খুলছে, নতুন বই প্রকাশ করবে আবার, ক-মাস খুব কষ্টে কেটেছে, অনলাইন বেচাকেনা ছিল ভরসা। ললিত বলল, কী হবে, কী হবে না, কিছুই বলা যাবে না, চলো ঘুরে আসি পুরুলিয়া থেকে।

মাথা নাড়ে কণিকা, বলল, যদি না আসে ঢেউ, খোকন চলে আসতে পারে।

ললিত চুপ করে থাকে। কণিকার না বেরোনোর কারণ তার পুত্র। সে এসে যেতে পারে। বোঝালেও বুঝবে না। সে তো পাশের পাড়া থেকে আসবে না। আসবে অন্য মহাদেশ থেকে।

কণিকা বলল, মহামারির সেকেন্ড ওয়েভ আসছে, এখন কেউ বেরোয়?

তাহলে খোকনই বা আসবে কী করে?

সে তো ঢেউ যদি না আসে, ঢেউ না এলে তো আসতেই পারে। কণিকা চুপ করে যায় কথাটা বলতে বলতে। মহামারির পরের ঢেউয়ের খবর সে-ই দিলো; কিন্তু তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছেই হচ্ছে না যে, আবার একটা ঢেউ আসছে। সেই ঢেউ আবার সব বন্ধ করে দেবে। তাদের পুত্র খোকন – অভিষেক আছে নিউইয়র্কে। গত জুলাইয়ে আসার কথা ছিল। আসেনি। আসতে পারেনি। তখন নিউইয়র্ক এক বিপজ্জনক শহর হয়ে গিয়েছিল। তার আগের জুলাই যখন, তখনো আসেনি। সেই সময় ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিউইয়র্ক এলো। কয়েকদিন আগে হোয়াটসঅ্যাপ কলে বলেছে, কোভিড কমলে আসবে; কিন্তু তারা সুইডেন গিয়েছিল সকলে মিলে। সে অবশ্য করোনা আসার আগে। আবার একটা ঢেউ আসা মানে ২০২২-২৩-এর আগে কি আসতে পারবে? মা-বাবা, এদেশের ওপর থেকে মায়া চলে গেছে মনে হয়। তার নিজের পরিবার, সন্তান হয়েছে। দীর্ঘশ্বাস নেয় ললিত। কণিকা মুক্ত হতে পারছে না। মানুষের এখন পাখির মতো হওয়া দরকার। সন্তান উড়ে গেছে পশ্চিমে। ওদেশে জিসি পেয়ে গেছে। কণিকা শুধুই ডাক দেয়, খোকন কবে ফিরবি? তাদের যাওয়ার কথা ছিল। তখন মহামারি এসে গেল।

ললিত খুব কষ্ট করে করেছিল বাড়িটি। তিন কাঠা জমি পেয়েছিল শহরতলির উত্তরাঞ্চলে এই জায়গায়। মিউনিসিপ্যালিটি কাছে, বাজার কাছে, হুগলী নদী-গঙ্গা কাছে। তখন এই পতিত জমি প্লটিং করে বিক্রি হচ্ছিল। গোটা পঞ্চাশ প্লট নিয়ে সারদা কলোনি। ললিতের মনে তখন একান্নবর্তী পরিবার গড়ার এক বাসনা জেগেছিল। তাই ঋণ নিয়ে দোতলা। দুই ভাই একতলায় থাকবে যখন আসবে। এক ভাই থাকে দিল্লি। অন্যজন বাঁকুড়া। তারাও বাড়ি করেছে, ফ্ল্যাট কিনেছে। ললিত আর কণিকা একবার বাঁকুড়া গিয়েছিল। সেখান থেকে বিষ্ণুপুর, মুকুটমণিপুর। দিল্লি গিয়ে বঙ্গভবনে উঠেছিল। সেখান থেকে নয়ডায় গিয়েছিল ভাইয়ের ফ্ল্যাটে। অনেকটা দূর। আর ফ্ল্যাট বেশি বড়ও নয়। বাক্সের মতো। নড়াচড়া কষ্টের।

উত্তর শহরতলির এক পুরনো পাড়ায় আধো অন্ধকার ফ্ল্যাটে ললিতের ছোটবেলা কেটেছে। তার বাবার জীবন কেটেছে। তাঁকে ললিত এই বাড়ি দেখাতে পেরেছিল। সে ললিত রায়। পূর্ববঙ্গে তাদের তেমন কিছু ছিল না যে তার জন্য বিলাপ করবে। তবুও একটা দুঃখ ছিল। নিজেদের গ্রাম, নিজেদের নদী, নিজেদের ভিটে ছিল তো। এই দেশে তা নেই। না থাকুক, সকলের কি থাকে? কলকাতা শহরে যত মানুষ থাকে সকলের কি নিজস্ব বাসস্থান আছে? নিজের বাড়ি বা নিজের ফ্ল্যাট? ললিতের সেই বাড়ি এখন নিঝুম, যা ছিল একসময় মানুষের কলরোলে ভরা। ললিত রায় এখন সত্তর হয়নি। কিন্তু হয়ে যাবে কয়েক বছরের ভেতর। ললিতের মনে হয়, গৃহবন্দি থাকতে থাকতে তার সত্তর কেন আশিও হয়ে গেছে যেন। কতদিন এমন যাবে কে জানে?

ললিতকে আমরা চিনে নিতে পারি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো করে। সেই যে তিনি ভালো থেকো, ময়ূরাক্ষী, পুনশ্চ, রবিবার ইত্যাদি সিনেমায় বৃদ্ধের চরিত্র করেছিলেন, তেমনি। আমার আপনাদের ভেতর যারা অমল বিমল কমল এবং ইন্দ্রজিৎ, মানে অতি সাধারণ, কমন ম্যান, তাঁদের ভেতরে যারা ল্যাপটপ ইন্টারনেট ইত্যাদি বোঝেন তাঁরা সন্ধেবেলায় ইউটিউবে কিংবা নানা অ্যাপে সিনেমা দেখতে দেখতে কখনো নিমীলিত চোখে ঢুলতে ঢুলতে এক ছবি থেকে আরেক ছবিতে চলে যান ছবির গল্প ভালো না লাগায়, তিনি ললিত হতে পারেন। এই ললিত বা এই কণিকা। করোনার সময় সিনেমা দেখার অভ্যাস হয়েছে ললিতের। আবার সিনেমা ভালো না লাগলে কণিকার পাশে বসে বাংলা টিভি ধারাবাহিক দেখে। কিছুটা দেখে ললিত ল্যাপটপ কিংবা মোবাইল ফোনে ফেসবুক খুলে নানা রকম লেখা পড়তে পড়তে সাবধানে লাইক মারতে মারতে কিছু সময় ব্যয় করে ফেলে। সময় নিয়েই হলো সমস্যা। ললিতের কাছে অঢেল সময়। ব্যয় করবে কী ভাবে? সাদা পায়জামা, সবুজ কিংবা মেরুন পাঞ্জাবি পরা ললিত উচ্চতায় ছ-ফুট, কেননা ময়ূরাক্ষী সিনেমার সেই বৃদ্ধটি যার স্মৃতি ক্রমশ বিলুপ্ত হচ্ছে, সে-ই যেন ললিত। ললিতের মনে হয়, সে-ই সে। করোনার সময় খুব সাবধানে থেকেছে ললিত।

বাড়িতে তারা আবার আসছে। সেই যে বনগাঁর ছোট মাসি এলেন তাঁর ছেলেকে নিয়ে। সেই যে ছোট ভাই এলো বাঁকুড়া থেকে। তার শ্বশুরবাড়িও বাঁকুড়া। এক-এক সময় ঝিমুনির ভেতর ললিত বা কণিকা চমকে ওঠে, আরেকটি সন্তান নিয়ে ললিতের পুত্র হাজির মার্কিন দেশ থেকে। দ্বিতীয় পৌত্রীকে ললিত বা কণিকা দেখেনি, তার জন্ম ২০১৯-এর ডিসেম্বরে।

কণিকা বলল, সেকেন্ড স্ট্রেন, নিউজপেপারে দিয়েছে। আবার লকডাউন, বেরোনো হবে না তোমার।

ললিত বলল, বেরোই আর কোথায়, বললাম অযোধ্যা পাহাড় যাই, এই সিজন খুব সুন্দর, পলাশের রঙে ভরা, মনে হবে আগুন জ্বলছে দূরে।

বারবার দেখে কী হয়, খোকন ফুরসত পেলেই চলে আসবে। কণিকার কথায় বিরক্তি।

ললিত বলতে গেল কিছু একটা, বলল না। মোবাইল বেজেছে। সে মোবাইল নিয়ে সরে গেল ব্যালকনির দিকে। এসব ফোন তার কলিগদের হয়। সকলেই একে-ওকে, সকলকে সকলে ফোন করে। ভাইরাস আসার আগে এমন হতো না। কোভিড-১৯ ভাইরাস এমন আতঙ্ক তৈরি করে দিয়েছে, সকলেই যেন ধরে নিয়েছে মৃত্যু শিয়রে। এমন এমন ঘটনা তো ঘটেই যাচ্ছে অবিরত। কত চেনা মানুষ মারা যাচ্ছে অকালে। যে-ফোন আসে, মৃত্যুসংবাদ নিয়েই আসে যেন। ফোন করে খোঁজ নেওয়ার একটা অর্থ হয়, খোঁজ নেওয়া হয়, সে বেঁচে আছে তো? অথবা সকলের কাছ থেকে যেন বিদায় নেওয়া। কোভিড তাকে ধরেছে।

অচেনা নাম্বার। সারা পশ্চিমবঙ্গজুড়ে তার কলিগ। নিজের সার্ভিসের লোক, তারপর সাব-অর্ডিনেট স্টাফ। করোনাকালে তাদের ফোন আসে বেশি। সেদিন যেমন একজন ফোন করল। আমি শ্যামল বসু কথা বলছি স্যার।

কোন শ্যামল বসু?

আপনার কি আমাকে মনে থাকবে স্যার?

আপনি কে বুঝতে পারছি না। ললিত বলেছিল।

আমি শ্যামল স্যার, আপনার অফিসে ছিলাম, সারভেয়র, মনে পড়ে।

পড়ল মনে। উনিশশো পঁচাশি-ছিয়াশি?

না না, তার আগে, আপনার যেবার জন্ডিস হলো স্যার।

ও আমি অন্য শ্যামলের কথা ভাবছিলাম, সে রায়, হ্যাঁ, জন্ডিস তো ১৯৮৩ সালে।

ইয়েস স্যার, আমি আপনার বেতন তুলে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতাম।

তুমি সেই লম্বা ফিটফাট ছেলেটি, সদ্য চাকরি পেয়ে জয়েন করলে।

ইয়েস স্যার, মনে পড়েছে তাহলে, আপনি কেমন আছেন?

মনে পড়েছিল ললিতের। কত বছর হয়ে গেল। প্রায় চল্লিশ। তার মানে ছেলেটির বয়স এখন ষাটের ওপর। সে এতোদিন বাদে তার নম্বর পেল কোথা থেকে! কোনো যোগাযোগ ছিল না গত চল্লিশ বছর প্রায়। ললিত এই মস্ত সময়ে নানা জেলা ঘুরে শেষে কলকাতায় থিতু হয়েছিল। কতদিন এই সারদা উপনিবেশ থেকে তমলুক যাতায়াত করেছে। ভোরে বেরোত। গঙ্গা পেরিয়ে হাওড়া স্টেশন। রাতে ফিরত ফেরি পার হয়ে বরানগর ঘাট। তারপর অটোয় বাড়ি। এই বাড়ি নিয়ে তার আহ্লাদ কম ছিল না। যে আসত তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাত। তাদের মতামত নিত। গাছে প্রথম যে-বছর আম এলো, সেই আম পুজোয় দিয়েছিল। কী পুজো? পুজো তার বাবা করেছিলেন। গাছকেই পুজো। প্রথম ফল গাছকেই উৎসর্গ করতে হয়। তারই সন্তান তো। সেই ফল পাখিতে খেলে বাড়ির মঙ্গল। এসব ললিতের মনে পড়ে।

আজ আর কলিগ কেউ নয়। অচেনা এক নারীকণ্ঠ। সুরেলা। মধুর বলা যায়। বরং তাও নয়, সেক্সি, হাস্কি গলায় সে জিজ্ঞেস করল, আমি কি ললিত রায়ের সঙ্গে কথা বলছি?

হ্যাঁ, বলুন। ললিত গম্ভীর হলো। অচেনা কণ্ঠস্বর হলে ললিতের ব্যক্তিত্ব আপনা-আপনি ফুটে ওঠে। সেই যে রবিবার ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ কথা বলছেন অচেনা নারীর সঙ্গে।

ললিত, আমি সুলগ্না।

কে সুলগ্না? ললিত মনে করতে চাইল কণ্ঠস্বরের অধিকারিণীকে। খুব চেনা মনে হয়। কোথায় শুনেছে। রেডিওতে? এফএম চ্যানেলে? রেডিও জকি? মনে করতে পারল না। তার খুব চেনা? অনেক বয়স। তার নাম ধরে ডাকে কণিকার দিদি বসিরহাটের তনিকা। এই নারী কে? যুবতী মনে হয়। তবু তাকে নাম ধরে ডাকল, মার্কিন রীতি। ললিত বিরক্ত হলো।

দুই

ওকে?

ললিত বিরক্ত হলো, বলল, হু আর ইউ, আপনি যে আমাকে নাম ধরে ডাকছেন, কত বয়স আপনার?

স্যরি, তুমি যে রেগে যাবে ভাবিনি আমি, অবশ্য অনেকেই রেগে যায়, পরে আমার শরণাপন্ন হয়, আই মিন আমাদের হেল্প নেয়, আমরা প্যান্ডেমিক পার হচ্ছি, কবে কী হবে জানি না, নেক্সট ওয়েভ আসছে, বহুত খতরনাক ওয়েভ, সব ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

তো কী হলো, ফোন করলেন কেন, ডোনেশন চান? ললিত জিজ্ঞেস করে।

নো স্যার, আমি ফান্ডিংয়ের জন্য ফোন করিনি, এই সিচুয়েশনে এমনি অনেক কোম্পানি গজিয়েছে যারা মিথ্যে বলে টাকা তোলে।

সবই মিথ্যে নয়, আম্ফানের সময় দিয়েছি, তারা সত্যিকারে রিলিফ নিয়ে গিয়েছিল বারবার।

দেখুন ললিত, আপনাদের সম্পর্কে সবকিছু জেনেই আমার যোগাযোগ করা, আমাদের অরগানাইজেশন হেল্পলেস পিপলের পাশে দাঁড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমরা আপনার পাশে আছি।

আমার সম্পর্কে কী জানো তুমি, আমরা হেল্পলেস নই। ললিত আবার বিরক্ত হলো। গায়ে পড়ে সাহায্য করতে চায়, আশ্চর্য! কোভিড পৃথিবীর অনেক কিছু বদলে দিয়েছে।

ইউ আর স্টেপিং টু সেভেন্টি, ইয়োর ডেট অফ বার্থ ...।

ললিত বলল, এটা কি স্পাই অরগানাইজেশন?

মধুর কণ্ঠে হাসে মেয়েটি, বলে, কী যে বলো তুমি স্যার, আমাদের অরগানাইজেশন ইজ ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, উই সার্ভ হেল্পলেস পিপল, হ্যালো, ইউ আর ভেরি হ্যান্ডসাম গাই, আমরা জানি ইউ নিড আওয়ার হেল্প।

নো, গায়ে পড়ে সাহায্য করতে আসছেন কেন?

তখন কণিকা জিজ্ঞেস করল, কার সঙ্গে কথা বলছ?

ললিত লাইন কেটে দিয়ে বলল, কেউ না, কত রকম লোক আছে, কত রকম তাদের উদ্দেশ্য।

কণিকা বলল, দিদি বলেছে অচেনা ফোন ধরবে না, ধরলেও বেশি কথা বলবে না, মহামারিতে ঠগ্‌-প্রবঞ্চকের সংখ্যা বেড়ে গেছে।

না, তেমন নয় মনে হয়।

আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, এটিএম কার্ডের ডিটেইল দেবে না, ব্যাংক সাফ করে দেবে। কণিকা বলল, কাগজে বেরোয় এমন কেস, জামতাড়া গ্যাং কলকাতায় এসে লোকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হানা দিচ্ছে, সাবধানে কথা বলো।

ললিতের মনে হলো কথাটা সত্যি। তাদের অফিসের দিবানাথ সোমের সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল একটি মেয়ে। বুড়ো দিবানাথ বিয়ে করেনি। এতো বয়সে এসে মনে হয়েছে, নারী দরকার জীবনে। সেই মেয়ে দিবানাথের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে দেড় লাখ টাকা তুলে নিয়েছে এটিএম পাসওয়ার্ড জেনে নিয়ে। মেয়েরাও জালিয়াতিতে নেমে পড়েছে।

ললিত বলল, জানি, আমাদের হেল্প করবে বলছিল।

কণিকা বলল, আমাদের আবার কিসের হেল্প, দরকার নেই, এসব ফোন কেটে দেবে।

ললিত কথা ঘোরায়, বলল, বলছি চলো ঘুরে আসি, বসিরহাট চলো, দিদি যেতে বলে কতবার।

মহামারিতে কারো বাড়ি যাওয়া ঠিক না, পরের ঢেউ এসে গেল প্রায়।

ললিত তখন সিঁড়ির মুখে গিয়ে ডাকল অশ্রুকে, চা দিবি।

অশ্রু সাড়া দিলো, দেব, দিদিরও চাই?

তখন কণিকা উদ্বিগ্ন হয়ে মোবাইলে তার দিদিকে ধরল, তোদের ওখানে সব কেমন দিদি, আবার একটা ঢেউ আসছে, মহামারি সহজে যায় না, কী যে হলো সব।

দিদি তনিকা বলল, কেউ মাস্ক পরে না, সেদিন দেবু ব্যানার্জির বাগানে একটা পিকনিক হলো, গেলাম, দেখি কারো মাস্ক নেই।

বাগানবাড়িটায় গেলি? কণিকা ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, জমায়েতে গেলি, ভয় করল না, এখন কি পিকনিকের সময়?

বাগানবাড়িটা খুব ভালো, গাছগাছালি, কত পাখি, বাঁশবাগান, পুকুর, অনেক ছায়া। তনিকা বলতে লাগল, কেমন ঘুঘুর ডাক, চোখ গেল পাখির ডাক, কোকিল, পুকুরে মাছ ঘুরছে, জলঢোঁড়া সাঁতরাচ্ছে ...।

গান গাইলি মাস্ক খুলে, ভয় করল না?

না, মাইক্রোফোন স্যানিটাইজ করে নিয়েছিলাম, সামনে কেউ ছিল না, সেদিন একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, মোসলেমা খাতুন।

সে কে?

গান লেখে, সুর দেয়, একটি স্বরলিপির বই দিলো আমাকে, লিরিক চমৎকার।

বাহ, তারপর কী হলো, ওর গান গাইলি?

নারে, সেই গীতিকার মারা গেছে, গিয়েছিল বোনের বাড়ি বিয়ে ঘরে, সেখান থেকে ফিরে করোনা হলো, চলে গেল দুদিনেই, সে কী সুন্দর সেজেছিল সেই দিন, সব জার্মান সিলভারের গয়না, দস্তার গয়না, কেন যে গেল অতদূর, সেই হাওড়া, সে বলেছিল ফিরে এসে আমার গানের একটা প্রোগ্রাম করবে টাউন হলে, সেদিন আমার গান খুব ভালো লেগেছিল কবির।

কী গান গেয়েছিলিরে দিদি? কণিকা জিজ্ঞেস করল।

দিদি তনিকা চুপটি করে থাকল, তারপর মৃদু গলায় বলল, গান আর কী গাইব রে, পাখিরা অবিশ্রান্ত গেয়ে যাচ্ছিল।

বাহ, তুই যেন কবি। কণিকা বলল।

আমি কেন কবি হতে যাব, গাইলাম, নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা বুঝিবা পথ ভুলে যায়।

সেই মণিহার, সৌমিত্র, সন্ধ্যা রায় আর বিশ্বজিৎ, কিন্তু দুপুরে ওই গান গায়!

দুপুর কেন হবে, তখন তো বেলা পড়ে এসেছিল রে, পাখিরা কলকল করছিল।

আচ্ছা, একটা গাইলি?

না, আর একটা অন্য গান, জলে ঢেউ খেলিয়া যায়, কইন্যা মাছ ধরিতে যায়। বলল তনিকা।

আর একটা ঢেউ আসছে শুনছি। কণিকা বলল, ঢেউয়ে গান ভেসে গেল।

কী জানি বুঝিনে, এদিকে শুধু ভোট, ভোটের মিছিলেই সব ছড়াবে। তনিকা বলল, ওদের ভয় নেই?

এই দ্যাখ না, আমাকে শুধু বলে চলো বেড়িয়ে আসি, আমি যে যাই না, ঠিক করি বল। কণিকা বলল।

কণিকা এবং তনিকা আরো কিছু কথা বলল। তখন ললিত ইজি চেয়ারে কাত হয়ে চোখ বুঁজে ছিল। এই মুহূর্তে আর কিছু করার নেই। দ্বিতীয় ঢেউ আসছে। আসুক। তারা ঘরেই থাকে, ঘরেই থাকবে। তবে ললিত এক-একদিন গঙ্গার দিকে হাঁটে। লঞ্চে করে বাগবাজার ঘাটে যায়। হাওড়ায় যায়। হাওড়া থেকে বাবুঘাট। জলের শোভা দেখে। গঙ্গার কূলে হাঁটে। কণিকা কিন্তু যাবে না এসবে। কোথাও নয়। কণিকা বলে, এইটা কি বেরোনো, গঙ্গা কি দেখিনি?

আলো-বাতাস। অস্ফুট গলায় বলেছে ললিত।

আলো-বাতাস ঘরে আছে যথেষ্ট, তুমি নিজে নিজে গঙ্গা দেখে বেড়াও, সাবধান না হলে বিপদে পড়বে।

ললিতের মনে বাগবাজার গঙ্গার ঘাটের কথা ঢেউ হয়ে এলো। মহালয়ায় তর্পণ করতে যতবার গেছে, দেখেছে বান আসে যখন, পরপর আসে। কিন্তু সে তো একই সময়ে প্রায়। কয়েক সেকেন্ডের তফাৎ হয় মাত্র। এই ঢেউ আসছে এক বছর বাদে। আগের বছর মার্চ মাসে ভাইরাস যেমন এসেছিল তার বন্ধু সুব্রতর মৃত্যুর পরপর। সুব্রত অবশ্য হার্ট অ্যাটাকে চলে গেছে। ললিতের এক কলিগ আছে গৌতম তালুকদার। বিয়ে করেনি। তার পোশাক ছিল ফুল প্যান্ট এবং একটি সাদা

টি-শার্ট। শীতের সময় তারই ওপর হাফ সোয়েটার কিংবা ফুল হাতা। গৌতমের অনেকগুলো একরকম টি-শার্ট ছিল। ইউনিয়ন করত।

এখন অবসরেও সকলের খোঁজ রাখে। বছরে একবার বৃদ্ধদের জমায়েত করে। পুজোর পর নভেম্বরে তা হয়। ললিত তিনবার গেছে। তারপর আর যাওয়া হয়নি। এখন আর ললিত যেতে চায় না। গেলে শুধু মৃত্যুসংবাদ শুনতে হয়। অসুস্থের কথা শুনতে হয়। বয়স বাড়লে শোক সংবাদ বেশি আসে। সুসংবাদ কম। তার একটি নাতনি হয়েছে দূর পশ্চিমে সন্ধ্যার সময়। তখন এদেশে সকাল হচ্ছে। একদিন আগে-পরে, জন্মতারিখ বদলে গেছে। ভিডিওকলে নাতনির মুখ দেখেছে, কিন্তু তাকে স্পর্শ করেনি। এটা সুসংবাদ না কোনো সংবাদই নয়, তা ললিত বুঝতে পারে না। এখন তো ভালো সময় যাচ্ছে, পনেরো দিনের জন্য আসতে পারত। এসে নাতনির মুখ দেখিয়ে যেতে পারত। এলোই না। ললিতের এক-এক সময় মনে হয়, এসেছিল হয়তো। পুনেতে এসে, পুনে থেকে চলে গেছে। বিশ্বাস হয় না ললিতের। কণিকা তাই বলে। তার সন্দেহ। পুনেতে তাদের পুত্রর শ্বশুরবাড়ি।

আবার ফোন এলো। গৌতম তালুকদার। কী খবর? কিন্তু ফোন কেটে গেল। ভুল করে চলে এসেছিল হয়তো তার কাছে। নাকি গৌতমের মনে হলো কথাটা ললিতদার জন্য নয়। সে তো একই কথা, ভুল করে চলে আসা কথা।

ঢেউ। সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় ললিত।

আমি ভাবলাম কেউ। অশ্রু বলল।

ভ্যাকসিন নিয়ে নাও অশ্রুদি।

অশ্রু মাথা নাড়ে। অনর্থক বাক্যব্যয় করে না সে। চা টিপয়ে রাখতে রাখতে সে জিজ্ঞেস করল, বাগবাজার যাবে তুমি দাদাবাবু?

দেখি, দরকার আছে? ললিত জিজ্ঞেস করল।

গঙ্গাজল নেই।

আচ্ছা। সংক্ষিপ্ত জবাবে নিশ্চিন্ত অশ্রুমতী নেমে গেল।

মিনিট কয় বাদে আবার ফোন এলো। সামনে টিপয়ে ধূমায়িত পেয়ালা। গৌতম ডাকল, ললিতদা।

ফোনটা কেটে গেল তখন।

আমিই কেটে দিলাম, জিতেনদার বাড়ি থেকে আরেকটা ফোন আসছিল।

জিতেন্দ্রচন্দ্র মহত্তম রায়, কবি?

হ্যাঁ ললিতদা। গৌতমের গলা বুঁজে গেল।

ললিতের সন্দেহ হলো, জিজ্ঞেস করল, তুমি কেন ফোন করলে বলো দেখি।

ললিতদা, আপনার কবি আর নেই।

জিতেন্দ্রচন্দ্র? ললিত জিজ্ঞেস করল বিমর্ষ গলায়। তালুকদার গৌতমের কণ্ঠস্বর চেনে ললিত। কোন গলা সুসংবাদের গলা, কোন গলা দুঃসংবাদের তা স্পষ্ট বুঝতে পারে সে। বুঝতে পারছে এই মহামারির কালে। গৌতম কত মৃত্যুসংবাদ দিয়েছে। কত উদ্বেগজনক সংবাদ দিয়েছে। আবার উদ্বেগ নিরসন করেছে। ললিতদা, অসীম পাল বাড়ি ফিরেছে, করোনা হেরে গেছে।

বাহ্, ওর বাড়ির আর কারো হয়নি তো? ললিত জিজ্ঞেস করেছিল।

কেন বউদির হয়েছিল, অসীমদাকে হাসপাতালে দিতে হয়েছিল, বউদি বাড়িতেই সেরে গেছেন।

কী হয়েছে গৌতম, জিতেনের তো কোভিড হয়নি, এই তো পরশুদিন ফোন করেছিল, চারটি কবিতা লিখেছে, আমাকে পাঠাবে একটু সংস্কার করে, আমাকে রিসাইট করতে হবে, আজো গুড মর্নিং করেছে, ধূসর নীল নিটোল চৌকো/ এসে গেল ভোরের নৌকো।

তাই! গৌতমের কণ্ঠ আরো বিমর্ষ, ভোরের নৌকো!

হ্যাঁ, ও বলল, একটু কাটাছেঁড়া করে পুরো কবিতার ছবি তুলে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেবে।

দিয়েছে? গৌতম জিজ্ঞেস করল।

না, দুদিন সময় নিয়েছিল, বলছিল মগরা যাবে একবার, কোভিড হলো নাকি, কেমন আছে?

গৌতম বলল, কী বলি বলুন দেখি ললিতদা, হি ইজ নো মোর।

কী বলছ তুমি গৌতম, আমি আজ ভোরেও ওর মেসেজ পেয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে, ধূসর নীল নিটোল চৌকো ...।

ভোরে মেসেজ পেয়েছেন, তারপরেই, এখন ন'টা বাজে, সাড়ে পাঁচটার সময়, ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক, ঘুম ভেঙেছে সবে, হাঁটতে বেরোবে

বলে উঠে পড়েছিল, চলেই গেল জিতেনদা। গৌতম বিড়বিড় করল, আপনার কবি চলে গেল সময় না দিয়ে।

চুপ করে থাকল ললিত। বিশ্বাস হচ্ছে। অবিশ্বাস হচ্ছে না। মৃত্যু এমনি আচমকা আসে শুনেছে ললিত। কার কাছে শুনেছে? মৃতরা তো খবর দেয়নি। পরিবার দিয়েছে। এই আছে এই নেই। জিতেন নেই। ললিতের কবি নেই। হ্যাঁ, ললিতেরই কবি। আর কারো নয়। ললিতই তাকে কবি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আর কেউ নয়। কোনো সহকর্মী নয়। ললিত বুঝে গেল আর কোনোদিন অবসরপ্রাপ্তদের জমায়েতে যাওয়া হবে না। জিতেন ইহজগৎ ত্যাগ করেছে। গিয়ে কী হবে? প্রতিবার গিয়ে এক-একজনকে অনুপস্থিত দেখবে। খোঁজ করতে গেলে শুনবে, শয্যাশায়ী কিংবা নেই। মৃত্যুসংবাদ কত শুনবে। অসুখ-বিসুখের কথা কত শুনবে। তারপর রাজনীতির কথা, কত শুনবে? ললিতের ওই এক পছন্দের মানুষ জিতেন্দ্রচন্দ্র মহত্তম রায়। সে কবিতা লিখেছে সারাজীবন ধরে। ছাপা হতো না তেমন কোথাও, পুজোর সুভ্যেনির কিংবা ইউনিয়নের মুখপত্র সম্বল। ইউনিয়নের মুখপত্র আবার বাদ দিয়েও দিত তার কবিতা। কারণ ভাববাদী কবিতা। ভাববাদও একটি মতবাদ। তা কেউ মান্য করলে অচ্ছুৎ? বাদ গেলেও জিতেন কিন্তু লিখত। বন্ধ করেনি হতাশ হয়ে। বৃদ্ধদের সেই জমায়েতে জিতেন তার কবিতা পড়ে শোনাত খাতা থেকে। সকলেই মুখটিপে হাসত। তার স্ত্রী গর্বিত মুখে স্বামীর দিকে

হলে পাঠ ভালো হয়। পরে আবার পাঠ করেছে জিতেনের লেখা। কিন্তু তা কবিতা নয়। বাল্যকালের কথা। আত্মকথা লিখতে আরম্ভ করেছিল সে। বাল্যকালের সেই হুগলির গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে শীর্ণকায় কুন্তি নদী বইছে। গ্রামের ইস্কুল। আমবাগান। কালবৈশাখি। নদীতে স্নান। তখন সেই নদীতে জল ঢুকত গঙ্গা দিয়ে। ঢেউ। এখন সে শিয়ালদার সারপেন্টাইন লেনে পুরনো একটি বাড়িতে ভাড়া থাকে। সেই লেনে যেতে বলেছে কতবার ললিতকে। ললিতের সময় হয়নি। কিন্তু তার সময় যায় কোথায়? জানে না ললিত। সে যায়নি কেননা শিয়ালদার সারপেন্টাইন লেন চেনে না। তবে কল্পনা করতে পারে, দুপাশে পুরনো বাড়ি, মাঝে বয়ে গেছে সারপেন্টাইন লেন। শীর্ণ নদী। কুন্তি নদীরই মতো। কুন্তি নদী আর বয় না যেমন, তেমনই সেই সারপেন্টাইন লেন।

তিন

কুন্তি নদী দামোদর থেকে বেরিয়ে গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে। দামোদরে জল নেই বর্ষা ছাড়া। দুর্গাপুর ব্যারেজের জন্য দামোদর শুকিয়ে থাকে হুগলি জেলায়। বর্ষায় কুন্তি নদী ভরে ওঠে। জিতেনের সেই আত্মকথা পাঠ করেছিল ললিত।

'আমার বাল্যকাল কাটিয়াছে কুন্তি নদীর তীরবর্তী 'রায়বাটি' গ্রামে। আমার পিতাঠাকুর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র মহত্তম রায় ধান-চালের ব্যবসা করিতেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ভবানীচন্দ্র মহত্তম রায় ছিলেন হুগলীর রাজা চৌধুরী বিলাসচন্দ্রর দেওয়ান। মহত্তম উপাধি হুগলীর রাজা প্রদত্ত। সমস্তটি খোলসা করে বলি, আমি জিতেন্দ্রচন্দ্র মহত্তম রায় আমার বংশের কথা তেমন জানি না। মহত্তম উপাধি নিশ্চিতভাবে কোনো রাজা কিংবা জমিদার বাহাদুর-প্রদত্ত। তিনি হুগলী জেলার রাজা হইতে পারেন। সবটাই আমার কল্পনা। এই আত্মকথা কাল্পনিক আত্মকথা। কাল্পনিক ইতিহাসে তা পরিপূর্ণ। কিন্তু এই কথা সত্য যে, আমার পূর্বপুরুষ নিশ্চিতভাবে কোনো মহৎ কর্ম করিয়াছিলেন। তাই মহত্তম রায় উপাধি প্রাপ্তি। আসলে আমরা হইলাম কুণ্ডু। কুণ্ডু হইয়াছি মহত্তম। আমাদের পিতামহ সুদের কারবারে বড় একখানি দালান স্থাপন করিয়াছিলেন। মহত্তম আমাদিগের সত্য পরিচয়, নাকি ইহা মিথ্যা তা আমি অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। আমাদের বংশে দান-ধ্যানের চিহ্ন নাই বলিলেই হয়। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম, মহত্তম হইব জীবনচর্চায়। সারাজীবন তাহাই করিয়াছি। ঋণ করি নাই। কাহারও গচ্ছিত অর্থ আত্মসাৎ করি নাই। কাহারও অনিষ্ট কামনা করি নাই বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা ঘটাইবার সাধ্য আমার ছিল না। আর পরে মনে হইয়াছে, ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হইবে আমার উপর। তাহা মঙ্গলজনক হইবে না, ...।'

পায়জামা, মেরুন পাঞ্জাবি, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, কণ্ঠস্বর ভারি, ললিতের সারাজীবনের আরাধ্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অথবা এই লেখক যে ললিতের কথা বলছে, তার ইচ্ছে মতো ললিতকে সেই বৃদ্ধ অভিনেতার মতো হয়ে উঠতে হয়েছে। ললিত সেই আত্মকথা পাঠ করতে করতে মগ্ন হয়ে ভেবেছিল কুন্তি নদীর ধারে সেও বড় হয়েছিল। ছেড়ে চলে এসে সারপেন্টাইন লেনে আশ্রয় পেয়েছে। ললিত থাকে গঙ্গার কাছে। তার বাড়ি অমনি কোনো শীর্ণকায় প্রায় মরে যাওয়া নদীর ধারে নয়। গলি-ঘুপচির ভেতরে নয়। কিন্তু তার আশ্রয়ের চেয়ে জিতেনের আশ্রয় তার কাছে অনেক মুগ্ধকর মনে হতো। গভীর রাতে সারপেন্টাইন লেন হয়ে ওঠে কুন্তি নদী। জিতেনের কবিতার একটি লাইন এমন ছিল। 'সেই লেন কিংবা সারপেন্টাইন নদী বেয়ে আসে খড়ের নৌকো/ বাতাসে জন্মের গন্ধ, ধূসর নীল, নিটোল, চৌকো।'

দামোদরের জল যায় হুগলি নদীর জলে। জিতেন নেই, তাই ললিত আর যাবে না সেই বৃদ্ধ-সমাবেশে।

ললিতের আর এক বন্ধু আছে সুমিত। সে নিউটাউনে একটি কোঅপারেটিভ ফ্ল্যাট করেছে। বড় ফ্ল্যাট। সুমিতের কথামতো প্রায় দু-হাজার দুশো বর্গফুট। তার একটি মেয়ে, থাকে লস অ্যাঞ্জেলস শহরে। পশ্চিমের পশ্চিমে। সূর্যের পশ্চিম দিকে মনে হয় ললিতের। সূর্যাস্ত যেদিকে হয়, তারও অনেক পশ্চিমে মনে হয় ললিতের। তো সুমিত বছরে ছ-মাস ওই দেশে থেকে আসে। বাকি ছ-মাস এই দেশে। করোনার কালে আর যেতে পারেনি। দুটি ভ্যাকসিন নিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে ভেবে রেখেছে। সেই সুমিত এখন তার বাইশশো বর্গফুট ফ্ল্যাট নিয়ে খুব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। অতবড় ফ্ল্যাটে দুজন মানুষ, কাজের লোক কাজ করে দিয়ে চলে যেত। কিন্তু এখন কেউ নেই। এজেন্সি থেকে বেশি পয়সা দিয়ে কুক নিয়ে আসতে হচ্ছে। করোনার সময় তার রান্না করার বিধবা মহিলাটি যে দেশে গেল জয়নগরে, আর ফেরেনি। অতবড় ফ্ল্যাটে বাস করতে হলে সব পরিষ্কার করতে হয় দৈনিক। কে করবে? যে করত সেও আর ফেরেনি। সন্ধের পর ফ্ল্যাটটা কেমন ভুতুড়ে হয়ে যায়। বেশি অংশ অন্ধকার। তাদের দুজনের জন্য কতটা আলো আর লাগে। একেবারে সূর্যাস্তের পেছনের অংশ হয়ে থাকে ফ্ল্যাটের অনেকটা যেন। সুমিত ভাবছে, সে-ফ্ল্যাট তালাবন্ধ করে কোনো বৃদ্ধাশ্রম কিংবা টেককেয়ার এজেন্সির কাছে চলে যাবে। ওই যে মেয়েজামাই, দুই নাতনি নিয়ে দেশে এলে তখন এজেন্সি দিয়ে ফ্ল্যাট সাফসুতরো করে সবাই বাস করবে কয়েক মাস। সে খবর নিয়েছে বৃদ্ধাশ্রমে কিছুই করতে হয় না। তাদের দুজনের জন্য একটি বড় ঘর। অনেকটা হোটেলের দামি সুইটের মতো। তারপর সকাল-বিকেল হাঁটা, যোগব্যায়াম আর নিচের লাইব্রেরিঘরে আড্ডা। কত রকম অনুষ্ঠান না হয় লাইব্রেরির

অডিটোরিয়ামে। সেখানেও অংশগ্রহণ করা যায়। সব খবর পেয়েছে সুমিত। সুমিত এবং লাবণ্য, দুজনেই চাকরি করত। তারা এসব ভাবছে; কিন্তু করতে পারছে না। সুমিত বলেছে, ললিত, শুনেছি ওদের খুব ভালো ব্যবস্থা, ওদের নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্সও আছে, ডাক্তার আছে, নিচে মেডিসিন শপ আছে, অসুবিধে নেই। ফ্ল্যাট তালাবন্ধ করে চলে যাব কি না ভাবছি।

ললিত এই পাড়ায় বহু বছর আছে। এই পাড়া ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না। এখানে কত বন্ধু। যাবে কেন? তারই এক স্কুলের বন্ধু অমলেন্দু সরকার একেবারে একা থাকে। তার ছেলে মিশিগানে। স্ত্রী বেঁচে নেই। মাঝে মধ্যে করিমপুর যায়। সেখানে তাদের পৈতৃক ভিটে। ছোট আর মেজো ভাই থাকে। তাদের কাছে গিয়ে থেকে আসে। সে বলে, কোথাও যাবে না। বেশ আছে। সাইকেলে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। আগে সিমলা, কুলু, মানালি বেড়াতে যেত। এখন ওসব বন্ধ।

ঘনশ্যাম গোস্বামী গত ১৫ তারিখে সজ্ঞানে অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন। এই খবর জানিয়েছে বর্ধমানেরই অসীম কোনার। ঘনশ্যাম গোস্বামী নামটি বহু বছর বাদে স্মরণে এলো। ভুলেই গিয়েছিল। প্রায় চল্লিশ বছর ছিল ললিতের চাকরিজীবন। কত মানুষের সঙ্গে বন্ধুতা ছিল। তাদের কতজন স্মৃতি থেকে ঝরে গেছে। আচমকা মনে পড়ে যায়, ঘুম ভাঙতে ভোরের বেলায় অথবা বেলা ফুরোতে গোধূলিবেলায়। ঘনশ্যাম গোস্বামী, জি জি বলে খ্যাত ছিল সে তাদের সার্ভিসে। জি জি-র সঙ্গে আর একটা জি যোগ হয়েছিল। ঘুষ। ঘনশ্যাম ঘুস্বামী বলত কেউ কেউ। অতি শীর্ণ এক ব্যক্তি, লম্বায় পাঁচ ফুট কয়েক ইঞ্চি, ছোট ছোট চোখ, সাদা বড় বড় দাঁত, একটু উঁচু, সরু কোমর। মাথায় চুল নেই প্রায়, এহেন ঘনশ্যাম অতি নিরীহ মুখের। সাত চড়ে রা কাড়ে না যাদের বলা হয়, তেমনি। জেলাশাসক একবার বলেছিল, শেক বিফোর ইউজ কী জানেন?

তিনিই ব্যাখ্যা করেছিলেন। ঘনশ্যামকে না ঝাঁকালে

কথাই বলে না। কিন্তু ডান হাত, বাঁ হাত দুই-ই চলে একসঙ্গে। ডান হাতে কলম, বাঁ হাতে টাকা। তো সেই ঘনশ্যাম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে বর্ধমান থাকার সময় পুত্রবধূর আত্মহত্যার কারণে গ্রেফতার হয়েছিল। কারণটি ললিত খবরের কাগজে পড়েছিল। তারপর টিভির খবরে দেখেছিল। চেনাই যায়নি তাকে। একটি ফুটবলপ্রায় নিরীহ এক প্রাণী। শোনা গিয়েছিল, সেই অসীম কোনারই বলেছিল, পণের টাকার জন্য পুত্রবধূর ওপর চাপ দিত ঘনশ্যাম এবং তার বউ। পুত্র বাবা-মায়ের কথার ওপরে কিছু বলত না। সেই ফৌজদারি মামলায় অনেক টাকা খসেছে ঘনশ্যামের। পনেরো লাখের মতো। মানে সারাজীবন যা উপরি পেয়েছিল তার বড় অংশ চলে গিয়েছিল। এক মাস হাজতে ছিল। তারপর জামিন। কেস চলতে লাগল। অবশেষে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ উঠে গেল। সে আবার চাকরি করতে গেল শান্তিপুরে। সেই ঘনশ্যাম নেই। ললিত ভাবে, ফোন করে গৌতমকে। জিজ্ঞেস করে, সেই যে মামলা চলছিল, কী হলো। ম্যানেজ করে নিয়েছিল নিশ্চয় ঘনশ্যাম। নির্দোষ প্রমাণ করেছিল নিজেকে। ললিতের চা এলো। এই সময় দুজনে চা খায়। কণিকা খবরের কাগজ পড়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে। ললিতকে কাগজের খবর পড়ে শোনায়। ললিত শুনতে চায় না, কিন্তু পছন্দের খবরের অংশীদারী করতে ইচ্ছে হয় তো। কণিকা বলল, ব্যাংকে টাকা না রেখে কোথায় রাখবে মানুষ?

ললিত বলল, জানি না।

আমাদের সব টাকা যদি কাগজ হয়ে যায়? কণিকার গলায় ভয়।

ললিত বলল, এসব খবর পড়ো কেন, কত ভয় নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে!

কথাটা কি সত্যি?

কোন কথা? ললিত জিজ্ঞেস করল।

পেনশন বন্ধ করে দেবে।

নতুন যারা ঢুকছে, তাদের পেনশন থাকবে না। বলল ললিত।

তুমি যোগ করে দেখো তো তোমার টাকা সব ঠিক আছে কি না।

আমরা আগে জন্মেছিলাম বলে ...। কণিকা কথা শেষ করল না। ললিত সাড়া দিলো না। কণিকা খবরের কাগজ পড়ে, টিভির নানা চ্যানেল দেখে, ইউটিউবে ভাসানো ভুয়ো ভিডিও দেখে। একটি ভিডিও এলো কলকাতার পশ্চিমে দাঙ্গা হয়ে গেছে। ছবিটা অন্য জায়গার এবং অনেক পুরনো। এসব দেখা যাচ্ছে, যা ঘটেনি। একটা লোকের ভিডিও ছিল, সে সাতদিন খায়নি। কণিকার ঠিক নজরে পড়ে। দুদিন বাদে জানা গেল সে এক যাত্রাদলের অভিনেতা। তাকে দিয়ে অভিনয় করানো হয়েছিল। কণিকা বহু গুজবে প্রভাবিত হয়ে ললিতের কাছে তার অ্যান্ড্রয়েড ফোনটি নিয়ে আসে। ললিত বলে, ওসব দেখো না। তবে এও সত্যি অনেক খবর সংবাদপত্রে আসে না। আসে না বলে সবদিক ঠিক থাকে। আবার খবর ঠিকঠাক না পেয়ে মানুষ গুজবে প্রভাবিত হয়। ললিতের মনে পড়ে সেই গণেশের দুধ খাওয়ার কথা। তখন মোবাইল ফোন, এতো টিভি চ্যানেল, ইউটিউব কিছুই ছিল না, কিন্তু সারাভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল এক সংবাদ। সব গণেশ মন্দিরে দুধ ঢালার ধুম পড়ে গিয়েছিল। কত দুধ নর্দমা দিয়ে গড়িয়ে গিয়েছিল নর্দমায়।

কণিকা বলল, ভাইরাস নাকি বুড়োদের মারার জন্য?

কণিকা বহু তথ্যের খোঁজ রাখে। একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মেম্বার সে। সেখানে কত রকম খবর আসে। সিনেমা, থিয়েটার, সাহিত্য,

রাজনীতি, অসুখ, মহামারি। খবর সেখানেই পেয়েছে মনে হয়। তবু ললিত জিজ্ঞেস করল, কে বলল?

কে যেন বলল, চিনে নাকি বৃদ্ধের সংখ্যা প্রচুর। কণিকা বলল।

তো কী হয়েছে?

তাদের পেনশন দিতে অনেক ব্যয় করতে হয় সরকারকে।

তারপর? ললিত জিজ্ঞেস করল।

তাই এই ভাইরাস এনেছে, বুড়োরাই মারা গেছে বেশি, আরো মারা যাবে, এখন নাকি পৃথিবীতে বৃদ্ধদের সংখ্যা বেশি, তারা কোনো কাজে লাগছে না। কণিকা বিমর্ষ গলায় বলল, তারা কিছুই করে না, বসে বসে খায়।

কালি ও কলম

অনেকটা নিকেশ না হলে ঢেউ আসতেই থাকবে।

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বেরিয়ে এসো, এই অসুখে মৃত্যুর হার থ্রি পারসেন্ট।

কণিকা বলল, আমাদের গ্রুপে ইতালির লোক আছে।

চিনের নেই?

কণিকা বলল, না, তুমি মেম্বার হবে?

শুধু ভয় পাওয়াবে, গুজব ছড়াবে?

এসব কি সত্যি নয়? কণিকা জিজ্ঞেস করে।

না, মিথ্যে, এতো ইয়াং মারা যাচ্ছে, ডাক্তার মারা যাচ্ছে, পুলিশ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মারা যাচ্ছে, তারা কি বুড়ো?

তখন আচমকা কণিকা বলল, তোমার সেই রাতের কথা মনে আছে?

কথাটায় ললিত চমকে উঠল। কণিকা হঠাৎ অতো পেছনে ফিরতে গেল কেন? কোথায় সে কোথায়? কতদূর পশ্চাতে সেই ঝড়জলের রাত। ললিত চুপ করে থাকল। কিন্তু কণিকা তো সেই রাত ফিরিয়ে আনতেই কথাটা তুলেছে। বলল, খোকন কীভাবে জন্মেছিল বলো? কী ভয় পেয়েছিলে তুমি, একা কী করবে সেই ঝড়জলে?

চার

দুপুরে ললিত বেরিয়েছে। তার মনে হচ্ছে, কণিকার কথা সত্য হতে পারে। কিন্তু তা চিন বা ইতালিতে। সেখানে সকল বৃদ্ধকে পেনশন দেয় সরকার। এখানে দেয় না। বরং সরকারি পেনশনারদের কাছ থেকে আয়কর কাটে। অথচ পেনশন তো ভাতা। মুনাফা নয়, বেতন নয়। কিন্তু আর একটি ঢেউ যে আসছে সে-বিষয়ে ললিত অবগত। অবগত হলেও কণিকাকে সাহস জোগানোর জন্য সে অস্বীকার করছে সেই সম্ভাবনাকে। করোনায় কত মৃত্যু হয়েছে। তাদের সারদা কলোনির অপূর্ব দাশগুপ্ত পুজোর সময় সপরিবারে গিয়েছিল বিশরপাড়া। শিয়ালদহ-বারাসত লাইনে এক ছোট জনপদ। বিশরপাড়ায় অপূর্বর বেয়াই বাড়ি, মেয়ের কাছে গিয়েছিল সে। সেই বাড়িতে হানা দিয়েছিল ভাইরাস। অপূর্বর স্ত্রী বিদিশাকে ধরে ফেলেছিল ডাকিনী। তারা ভেবেছিল সামান্য জ্বর। টেস্ট করেছে দেরিতে। শেষে ডাক্তার যখন বলল হাসপাতালে দিতে, তারা কোথাও হাসপাতাল, নার্সিং হোম পায় না। সারাদিন রোগীকে নিয়ে ঘুরে শেষে দক্ষিণ কলকাতার প্রান্তে এক নার্সিং হোমে যখন অনেক রাতে জায়গা পেল বিদিশা, তখন অক্সিজেন লেভেল কুড়ির নিচে। তা আর উঠল না। অপূর্ব একদম একা হয়ে গেছে। কী বিমর্ষ মুখ। বলে, তার আর বেঁচে থাকার দরকার নেই। বাড়ি থেকে বেরোয় না। জানালা দিয়ে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। সব ললিতের মুখে টেলিফোনে শুনে জিতেন লিখেছিল, 'ডাকিনী ঘুরিতেছে, দুয়ার বন্ধ করো, প্রদোষকালে কুন্তি ঘাটে মাটির কলস ভরো।'

ললিত বেরিয়েছে গঙ্গার ঘাটের দিকে। হাওড়া যাবে। এখন অল্প ট্রেন চলছে। স্পেশাল ট্রেন। সেই ট্রেন বোঝাই করে মানুষ আসছে নানা দিক থেকে। বরানগর ঘাটে কোনো ফেরি লঞ্চ নেই। ওদিক থেকে আসবে আড়াইটে নাগাদ। এখন পৌনে দুটো। ঘাটে তেমন লোক নেই। ফেরি লঞ্চ গেছে সাত মিনিট আগে। ওই দেখা যাচ্ছে হাওড়ার দিকে মন্থরগতিতে জোয়ার ঠেলে এগোচ্ছে। ললিত বসল ঘাটের ধারে একটি বেঞ্চে। একদম খালি জায়গাটা। যারা পারাপার করে তারা সময় জানে। সময়ে আসে। এখন তো লঞ্চের সংখ্যা খুব কমে গেছে। যাত্রীও কম। খরচ ওঠে না বুঝি। ললিত দেখল গঙ্গার ওপারে মিলের চোঙ থেকে ধোঁয়া উঠছে। বন্ধ মিল খুলল তাহলে? সব স্বাভাবিক হচ্ছে। স্বাভাবিক যখন হচ্ছে, তখন আরেক ঢেউ! ফোন বাজল। ললিত দেখল আবার গৌতম তালুকদার। বলল, ললিতদা, বরুণ দত্তর খবর শুনেছেন।

ললিত বলল, আলিপুরদুয়ার থাকে শুনেছিলাম।

হ্যাঁ, কলকাতা বদলি নিয়ে প্রায় পালিয়ে আলিপুরদুয়ার, বউদি ওর পেনশনের ভাগ ক্লেইম করেছিল, পায়নি।

তাহলে কী করে চলে বরুণের বউয়ের?

মেয়ে সাহায্য করে মাকে, নিয়ে রেখে দেয়। গৌতম বলল, মেয়েটা চাকরি করে।

বরুণ নরাধম। বিড়বিড় করল ললিত। বরুণকে খুব ভালো চেনে ললিত। শুধু বানিয়ে বানিয়ে কথা বলত। দু-হাতে পয়সা খেত। বরুণ এক-একদিন এক-একটা কথা মুখে করে আসত। সরল মুখে অসত্য কথা। তার ভেতরে কোনো কোনোটি ছিল আশাব্যঞ্জক, কোনোটি ছিল ভয় ধরানো। ভয় ধরানো কথাই মানুষের ভেতরে দ্রুত ছড়ায়। মনে পড়ল, একদিন সে এসে বলল, পঞ্চান্ন বছরে অবসর হয়ে যাবে। একদিন এসে বলল, সরকার আর ডিএ দেবে না। গৌতম বলল, সেই বরুণ দত্ত নাকি মারা গেছে।

তাই, কোভিড? মন খারাপ হলো ললিতের। মৃত্যু মৃত্যু আর মৃত্যু। মহামৃত্যুর মহোৎসব চলছে যেন। সে যে কোনো কোনোদিন বাইরে বেরোয় দুপুরে, তা যেন মৃত্যুর বিপক্ষে দাঁড়ানো। ডাকিনীর ভয়ে বন্ধ দুয়ার, দুয়ার ভেঙেছে কুন্তির ঢেউ। জিতেনের লেখা। যা মনে হতো লিখত কবি। সেই কবি গতকাল মারা গেছে সকালে গুড মর্নিং বলে গোলাপের তোড়া পাঠিয়ে দেড়-দু ঘণ্টার ভেতরে চোখ বুঁজেছে। কবিতা নিয়ে চলে গেল। নিজের মৃত্যু নিয়ে কবিতা হলো না। জিতেনের আকস্মিক মৃত্যু খুব দমিয়ে দিয়েছে ললিতকে।

না মার্ডারড, নেপালি বউ কুকরি দিয়ে কুপিয়েছে।

কুপিয়েছে, সত্যি বলছ? ললিত যেন দৃশ্যটিকে দেখতে পায়। বরুণ দত্ত মানুষটি দুশ্চরিত্র। প্রথম পক্ষকে ত্যাগ করেছিল নিষ্ঠুরভাবে। তখন তার সঙ্গে অফিসের এক তরুণী ক্লার্কের সম্পর্ক হয়েছিল। মেয়েটি সদ্য ঢুকেছিল চাকরিতে। বরুণ তার বস। অফিসে হয়তো এমনিই হয়, সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। সেই তরুণী পরে অভিযোগ করেছিল বরুণের বিরুদ্ধে। তখনই সে বদলি হয় উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গ তার পছন্দের জায়গা ছিল। চাকরি আরম্ভ করেছিল উত্তরবঙ্গেই। বউ ফেলে রেখে চলে গেল আলিপুরদুয়ার। অদ্ভুত মানুষ ছিল বরুণ। বিলাসী পুরুষ। দামি মদ, দামি সিগারেট, মাথায় কোরিয়ান পদ্ধতিতে কেশ রোপণ ... এসবই ছিল তার বিশেষত্ব। সে বাঁচেনি শেষ পর্যন্ত। ওখানে গিয়ে অন্য নারীতে আসক্ত হয়েছিল নিশ্চয়ই। নেপালি বউ তা সহ্য করতে পারেনি।

হ্যাঁ ললিতদা, শ্যামল সরকার উত্তরবঙ্গ থেকে খবর দিলো।

শ্যামল সরকার কি আলিপুরদুয়ার থাকে? ললিত জিজ্ঞেস করল।

না দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট, ওকে সসীম ব্যানার্জি জানিয়েছে।

সসীম কে? ললিত জিজ্ঞেস করল।

আপনি চিনবেন না, ইয়াং অফিসার, পাঁচ বছর জয়েন করেছে। গৌতম বলল।

আচ্ছা, কুকরি দিয়ে কুপিয়ে মেরেছে, ও কি আবার কোনো মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল?

সবটা জানি না ললিতদা, পরে বলব, তবে সেই রকম হওয়াই সম্ভব।

খুব খারাপ পরিণতি। বলল ললিত।

গৌতম বলল, সব জানি, আপনাকে জানাব, বরুণদা মারা গেলে এবার ফ্যামিলি পেনশন যেন বন্দনা বউদি পায়, আমরা চেষ্টা করব, হেড অফিসে যাবে আমাদের ইউনিয়ন।

হুঁ। চুপ করে থাকে ললিত। দ্বিতীয় স্ত্রী নিজেই তার স্বামীকে হত্যা করে থাকে যদি, সে থাকবে জেলে আর দ্বিতীয় বিয়ে বৈধ নয়। সুতরাং গৌতম চেষ্টা করতে পারে বরুণের প্রথম পক্ষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে। উত্তরবঙ্গে গিয়ে কলকাতার বন্দনা কিছুই করতে পারেনি। বরুণ তাকে অস্বীকার করে খেদিয়ে দিয়েছিল। গৌতম ফোন কেটে দিয়েছে। ললিত বসে আছে ফেরিঘাটে। এখনো মিনিট পনেরো বাকি। গুটিগুটি জনাপনেরো এসেছে। একটি লঞ্চে একশর ওপরে যাত্রী ধরেই। পরের ফেরি ছাড়বে তো?

ফেরি আসছে। ভর্তি লোক। ললিত ভাবল, যাবে ওপারে, নাকি যাবে না? হাওড়া থেকে এতো লোক আসছে, কয়েকজন হাওড়া যাচ্ছে। সে যাবে, না এখানে বসেই দেখবে কারা আসছে। চেনা কেউ, আবছা মনে পড়া মানুষ আসছে কি? কয়েকদিন ধরেই কণিকা সেই অদ্ভুত রাত্রির কথা বলছে। আসলে সে অধীর হয়ে উঠেছে তার ছেলের জন্য। ললিত বুঝেছে, পাখির ডানা গজিয়েছে, তার ফেরা না ফেরা তারই মর্জিমাফিক। তাদের পুত্র খোকন – অভিষেকের জন্ম ছিল একটা ঘটনা। সেই রাত ছিল দেবতার রাত। দেবতা পাশে না দাঁড়ালে মা এবং সন্তানের জীবন রক্ষা হতো না। সেই যে কয়েকদিন ধরে চলছিল মহাশ্রাবণের ধারাপাত। বঙ্গোপসাগরে অবিরাম নিম্নচাপ জন্ম নিয়ে যাচ্ছিল। ললিত অফিস যায়নি। কলকাতা ভেসে গিয়েছিল। সারদা কলোনিও ভেসে গিয়েছিল। বরানগরের মতো উঁচু জায়গাও জলে ডুবে গিয়েছিল। সন্ধে থেকে কুনকুনে ব্যথা উঠছিল। ললিত ভেবেছিল পরদিন সকালে ব্যবস্থা নেবে। কণিকাও ভেবেছিল তেমন। পরদিন গেলেই হবে। তাদের প্রথম সন্তান।

ফেরি এসে গেছে। ললিত যাত্রীদের দেখতে থাকে। কতরকম মুখ। কিছু লোক মাস্কে মুখ ঢেকে, কিছুর ওসব বালাই নেই। ললিত ভাবল, যাবে না ওপারে। বরং এই সদ্য তপ্ত হয়ে ওঠা রোদে ছেয়ে থাকা নদীর ধারে বসে থাকে অশ্বত্থের ছায়ায়। এই সময় মুখটি দেখল ললিত। সেই কৃষ্ণবর্ণ মুখ, তার ওপর নীলচে সার্জিক্যাল মাস্ক। বেশ লম্বা। মাথা ফাঁকা হয়ে গেছে। যেটুকু চুল আছে, তা সাদা হয়ে গেছে অনেকটা। সে কি? সে-ই। না না, সে আসবে কেন এদিকে। এদিকে তার কে? এদিকে ললিত আছে। ললিতের কাছে সে পঞ্চাশ টাকা পায়। তাছাড়া আর কত হবে সেই পঁয়ত্রিশ বছর আগে। আরো কম হতে পারে। তখন মিনিমাম বাস ভাড়া ছিল দশ পয়সা। সেইটা এক ধাক্কায় কুড়ি পয়সা হলো ১৯৯০ নাগাদ। এইটুকু মনে আছে ললিতের। বরানগর সারদা কলোনি থেকে আর জি কর হাসপাতাল কত

ভাড়া হতে পারে ট্যাক্সিতে? লোকটা বুড়ো হয়ে গেল। হ্যাঁ। ললিতও বুড়ো হয়েছে। তাহলে পথের দেবতা, কুড়িয়ে পাওয়া দেবতাও বুড়ো হয়? ললিত গত কয়েকদিন ধরে লোকটার কথা মনে করছে। এতো বছর তো ভুলেই ছিল বেশ। কণিকা গত কয়েকদিন ধরে মনে পড়াচ্ছে সেই রাতের কথা। সেই রাত মানে ঈশ্বরের রাত। ঈশ্বর পাশে না থাকলে ভেসেই যেত জীবন। ললিত দ্রুত টিকেট কাউন্টারের দিকে ছুটল। কিন্তু লঞ্চের ভোঁ বেজে গেছে তখন। লোকটা বরানগরে এসেছিল। হ্যাঁ সেই লোকটা। যার কথা গত দুদিন ধরে কণিকা বলছে। তাকে নয় শুধু, তনিকা দিদিকেও শোনাচ্ছিল ফোনে। কদিন খুব মনে পড়ছে রে দিদি।

ও আসবে, মহামারি চলছে, ফ্লাইট বন্ধ। তনিকা প্রবোধ দিলো বোনকে।

না, ফ্লাইট, খুলেছে আবার, কিন্তু আমার মনে পড়ছে সেই লোকটার কথা, লোকটা নিজে নিজে না বলে চলে গেল।

তনিকা বলেছিল, তুই বসিরহাট আয়, ইছামতীতে নৌকো করে ঘুরব।

তুই বললি ফ্লাইট খুলেছে, ও যদি এসে পড়ে।

ফোন করবে তো এলে।

কণিকা বলেছিল, ও সারপ্রাইজ দিতে ভালোবাসে, আচমকা চলে আসবে, এই যে বলেছে চব্বিশ-পঁচিশের আগে আসতে পারবে না, আসলে যে-কোনোদিন আসতে পারে, এসে যাবে, সারপ্রাইজ বয়, ওর জন্মের সঙ্গে সারপ্রাইজ জড়িয়ে আছে, একটা লোক এলো আর ভ্যানিশ হয়ে গেল, দিদি তুই তো জানিস সে-কথা।

সেই লোকটা পার হয়ে গেল হুগলী নদী। গঙ্গা। তার মানে পার হয়ে এসেছিল এপারে। কেন এসেছিল? ললিত রায় এবং কণিকা রায়ের খোঁজে? ললিতের কাছে সে পাওনা রেখে চলে গিয়েছিল। গিয়েছিল বা যেতে বাধ্য হয়েছিল। জন্ম-মৃত্যুর মতো সম্ভাব্য কোনো ঘটনা সমুখে এসে গিয়েছিল হয়তো। ললিত ভাবছিল, সে ফেরিঘাটে এসে পার না হয়ে অশ্বত্থের ছায়ায় বসে থাকল কেন? পার হওয়ার প্রস্তুতি থাকা উচিত ছিল। সে কি পরের ফেরির জন্য অপেক্ষা করবে? পরের ফেরিতে পার হয়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে খোঁজ করবে লোকটার? কিন্তু সে যে নদীর ওপারে গিয়েছে এমন নাও হতে পারে। গঙ্গার এই তীরে, পূর্ব উপকূলে পরপর ফেরিঘাট আছে। বাগবাজার, আহিরিটোলা, চিৎপুর, বিবাদীবাগ, ফেয়ারলি প্লেস, বাবুঘাট, আউটরামঘাট হয়ে বজবজ। বজবজের দিকে অবশ্য এই ফেরি যায় না। বাবুঘাটে শেষ। লোকটা বরানগর থেকে আহিরিটোলা, চিৎপুর কিংবা বিবাদীবাগ যেতে পারে। সে কোথায় খুঁজবে ৪৫ মিনিট বাদে পরের ফেরিতে যাত্রা করে? কোন ঘাটে নামবে? সে যদি পার হয়ে যায়, হাওড়া স্টেশন থেকে যে-কোনো দিকে চলে যেতে পারে। বর্ধমান লাইন, খড়্গপুর লাইন, যে-কোনো লাইনের ট্রেনে উঠে গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করতে পারে। বর্ধমান লাইন দুটি, মেইন লাইন এবং কর্ড লাইন। আলাদা আলাদা স্টেশন সব। মেইন লাইনের ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে কাটোয়া লাইন চলে গেছে আরেকদিকে। সেদিকেও যাওয়া যায়। কত লাইন কত স্টেশন। ভেবে কিনারা পায় না ললিত। তখন তার মোবাইল বাজল। কেউ কথা বলতে চায় যাকে সে চেনে না। অচেনা নম্বর। ললিত ফোন অন করে জিজ্ঞেস করল, কে বলছেন?

আমি সুলগ্না স্যার, আপনি ফেরিঘাটে?

কে সুলগ্না? ললিত বিরক্ত হলো, কী দরকার বলুন।

হাই ললিত, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন, তখন কথাটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, তাই আবার ফোন করা।

ললিত বলল, আমি কথা বলতে চাই না, ডিস্টার্ব করবেন না, আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো না।

আচ্ছা স্যার, আমি সুলগ্না বলছি, আমাদের এজেন্সি আপনাদের ওপর নজর রাখছে সবসময়, আপনারা একা এবং একা, আপনাদের সাহায্য দরকার যে-কোনো রকমের, কী রকম তা আমরা নির্ধারণ করছি, একা মনে করবেন না স্যার, আমরা আছি।

আপনারা কারা?

আমরা টেককেয়ার এজেন্সি, আমাদের নাম সুলগ্না, সুলগ্না টেককেয়ার এজেন্সি, যে কথা বলবে আপনাদের সঙ্গে সে-ই সুলগ্না, ললিত স্যার, আপনি এই মহামারির ভেতরে নদীঘাটে বসে আছেন একা একা, কেন?

ললিত বলল, আপনাদের কাজ স্পাইয়িং, নজরদারি করছেন, আমি ফেরিঘাটে নেই, আমি বাড়িতে। বলতে বলতে সে আবার লাইন কেটে দিলো।

পাঁচ

ললিত বাড়ি ফিরল মন খারাপ করেই। আসলে গত কয়েকদিন ধরে কণিকা সেই কথাটা তুলছে। ছেলে গেছে বিদেশ-বিভুঁই, তার জন্মের সময়টি ভেসে আসছে কণিকার কাছে। ললিত কদিন ধরে ভাবছিল সেই লোকটির সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। ছেলের বয়স তেত্রিশ, লোকটা তেত্রিশ বছর আগের। তেত্রিশ বছর আগের এক বর্ষণপ্লাবিত রাত্রে এক ঘণ্টার দেখা – মুখ কি এখন চেনা সম্ভব। সম্ভব। ললিতের মনে হয় সম্ভব। আজই তা সম্ভব হতে হতে হয়নি। সেই লোকটি এতো বছর বাদে নদী পার হয়ে গেছে তার সামনে থেকে। সতর্ক থাকলে সে তাকে দাঁড় করাতে পারত। এই যে মশায়, আপনিই সে।

কার কথা বলছেন?

ইন দ্য ইয়ার নাইন্টিন নাইন্টি, ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরের উনিশ তারিখ, ১৯.০৯.১৯৯০।

তিরিশ বছর পেছনে যেতে হবে, তখন আমি তিরিশ।

ওই তারিখ কেন, আগে-পরে খুব বৃষ্টি, ভেসে গিয়েছিল চারদিক, বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ হয়েছিল, কণিকার তখন আজ অথবা কাল, আমরা তখন সবে এসেছি সারদা কলোনিতে, বাড়ি একতলা হয়েছিল কোনোরকমে, দুটি ঘর। কিচেন, টয়লেট, এক ফালি। কলোনির অধিকাংশ প্লট খালি পড়ে ছিল। কেমন নিঝুম ছিল জায়গাটা। কণিকা সারাদিন ভালো ছিল। সন্ধ্যা থেকে শরীর আনচান করছিল। কুনকুনে ব্যথা উঠছিল। ভুল করেছিল ললিত। ভেবেছিল বৃষ্টি ধরলে নিয়ে যাবে আর জি কর হাসপাতালে। বৃষ্টি আরো ঝেঁপে এসেছিল। সন্ধেবেলায় ব্যথা কমে গিয়েছিল। তখন তার মনে হয়েছিল, বৃষ্টি রাতেই থামবে, সকালে নিয়ে যাবে হাসপাতালে। পূর্ণগর্ভা নারীকে বাড়িতে রেখে দেওয়া ঝুঁকির হয়ে যাবে; কিন্তু রাত দশটার পর ব্যথা উঠল আবার। শরীরের যাবতীয় অস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে রাতে।

বাতাসও ছিল। ছাতা সামলে রাখা কঠিন হয়ে উঠেছিল। রাস্তা ছিল জনমানবশূন্য। ললিত মেইন রাস্তা ধরে ট্যাক্সির আশায় হাঁটছিল। দুটি পেয়েও ছিল, কিন্তু না দাঁড়িয়ে বেগে তাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। সকলেই নিজের ডেরায় ফিরছিল। একটা বাস এলো ধর্মতলা থেকে, নামিয়ে দিলো দুটি লোককে। তারা নেমেই ছাতার আড়ালে গিয়ে ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে। বিপন্ন হয়ে পড়েছিল ললিত। রাস্তায় জল জমে গেছে। কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। সারদা কলোনির কোনো বাড়িতেই টেলিফোন ছিল না। তখন রাস্তার ধারের টেলিফোন বুথই ভরসা। মোবাইল যুগ দূর ভবিষ্যতে। কোনো বুথই খোলা ছিল না যে প্রেসক্রিপশন দেখে ডাক্তারকে ফোন করবে। হাল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল পথের ধারে। তখনই সে এসে দাঁড়িয়েছিল পাশে, ট্যাক্সি খুঁজছেন?

ফোন এলো। এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কণিকা তার মোবাইলে ধরেছে তার খুড়তুতো বোন নীলাকে। নীলা খুব দুঃখী। তার পুত্রটি মারা গেছে বছরদুই আগে। পুত্র তার নিজের নয়, সে সন্তানহীনা, দিদির মাতৃহীন সন্তানকে সে মানুষ করেছিল। বিয়ে দিয়েছিল। নাতির মুখ দেখেছিল। সে খুব সুন্দর এক জীবন হয়েছিল। কিন্তু ভগবান কার সুখ সহ্য করতে পারে! ঘুমের ঘোরে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মারা গেল সেই পুত্র, সংসার দু-বছরের ভেতর ছারখার হয়ে গেল। পুত্রবধূ বিয়ে করল। সন্তান নিয়ে তাদের ত্যাগ করে গেল। তারপর থেকে নীলা আর তুহিনদা নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। নাতির বয়স চার হয়েছিল। ছ-মাস যখন, পিতৃহারা হয়েছে। কণিকা আর নীলায় খুব কথা হয়। একজন অন্যকে দুঃখের কথা বলে। ভয়ের কথা বলে। কিন্তু নীলার ভয় নেই। তার পুত্র, পৌত্র সব কোলছাড়া হয়ে গেছে, এখন কিসে ভয়? কিসের জন্য ভয়? নীলা বেপরোয়া। তার পুত্রবধূ বিয়ে করেছে মন্দিরতলা। সেখানে ফ্ল্যাট। সহকর্মী দুজনে। বোধহয় আগের বিয়েটা তার মনের মতো হয়নি। এমন সন্দেহ হয় এখন। হয়তো আগে তাদের ভেতরে প্রেম ছিল। কিছুই অসম্ভব নয়। তা জানতে পেরেছিল মনে হয় নীলার পালিত পুত্র। তাদের ভেতরে মিল ছিল না। ছেলে বিমর্ষ থাকত সবসময়। তারপর তো হার্ট অ্যাটাক হলো। কলহ হয়েছিল সেই অ্যাটাকের আগে। নীলা তার দুঃখের কথা কণিকাকে বলে। প্রায়ই ফোন করে। কণিকাও করে। কণিকা নীলাকে বলছে সেই ঝড়জলের রাতের কথা। প্রবল বর্ষণের কথা। সেই রাতের কথা নীলা শুনেছে অনেকবার, তবুও শুনছে। নীলা বলে, বল কণি, দুঃখের ভেতরে তোর সেই কথা আমার ভেতরে তো আশা জাগায়। মনে হয়, নাতিটাকে নিয়ে বউ আসবে এ-বাড়িতে। সে যে বিয়ে করেছে তাতে আমার ক্ষোভ নেই। এতোটা জীবন কাটাবে কী করে? কিন্তু ছেলেটাকে দেখাবে তো। নাতির মুখে আমার ছেলের মুখ বসানো। বুবাই ঠিক অমনি ছিল। ওর মা মারা গেল ওর দেড় বছর বয়সে। হার্টে ছিদ্র ছিল। মায়ের কাছ থেকে সেই হৃদয় বুবাই পেয়েছিল। ...। কত কথা নীলার। শুনতে শুনতে কণিকা বলে, কটা দিন যেতে দে, ঠিক আসবে তোর কাছে, আসবেই, সে তো আর আমেরিকা যায়নি, গেছে তো মন্দিরতলা, পাশের পাড়া।

আমেরিকা গেলে তো ঠিক ছিল রে, আমি ভাবতাম মহামারি চলছে, অতদূর থেকে আসবে কীভাবে, মন প্রবোধ মানত।

মহামারি তো এলো সেদিনরে, দেড় বছর, তার আগে তিন বছর আসেনিরে, ’১৬ সালে এলো, তারপর তার সময় হলো না, ছেলের পর একটা মেয়ে হলো মহামারির ভেতরে, তার গা ছুঁয়ে দেখলাম না, সে কি আর আসবে আমাকে দেখাতে, জগৎ এমনি, সন্তানও পর হয়ে যায়।

যায় তো। নীলা বলে, যায় রে, সেদিন হাইকোর্ট কোন এক মামলায় রায় দিয়েছে, বুড়ো মা-বাবার দায়িত্ব নিতে হবে, কোন এক ছেলে তার বাবার করা বাড়ি থেকে মাকে বের করে দিয়েছিল।

এমনি কথা হচ্ছিল দুজনে, তখন ললিতের ফোন বাজল। ললিত ধরতে সে বলল, বাড়ি ফিরেছেন তো স্যার, কথা তখন শেষ হয়নি।

কী কথা? ললিত ব্যালকনিতে বেতের চেয়ারে একটু হেলে বসেছিল। নিচে সারদা কলোনির রাস্তার ধারে পরপর গাড়ি রাখা। গ্যারেজ নেই, গাড়ি কিনেছে অনেক লোক, কলোনি কমিটি সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। রাস্তা এতে সংকীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু উপায় নেই। কয়েকটি বাড়ি জোট হয়ে প্রমোটারকে দিয়েছিল। আকাশচুম্বী বাড়ি উঠেছে সারদা কলোনিতে। নিঝুম পাড়াটিতে ত্রস্ত মানুষের চলাফেরা দেখছিল ললিত। তখন ফোন এলো। সেই কথা হতে লাগল।

মহামারি মানুষের অনেক অভ্যাস বদল করে দিয়েছে। ফোন করার অভ্যাস বাড়িয়ে দিয়েছে। কণ্ঠস্বর শুনলে তবু মনে হয় একা হয়ে যায়নি মানুষ। ললিতের মনে হলো, বিরক্তি প্রকাশ না করে শোনা যাক সুলগ্নার কথা। সুলগ্না টেককেয়ার অর্গানাইজেশন কী বলে। সে বলল, বাড়িতে যে ছিলাম না একথা কে বলল?

ছিলেন না সত্যি স্যার।

আপনাদের কেউ নজরে রেখেছে আমাকে? ললিত বলল।

সে আমাদের বিজনেস সিক্রেট।

আপনারা কী বিজনেস করেন, লোকের ওপর নজরদারি?

নো স্যার, নামেই বুঝতে পারছেন আমরা মানুষের সেবা করি, অর্গানাইজেশনকে বাংলায় আমরা বলি সুলগ্না সেবা প্রতিষ্ঠান, সেবাই আমাদের ধর্ম ললিতদা। মেয়েটি বা সুলগ্না নরম গলায় বলল। কিন্তু সেই নরম গলাই ললিতের কাছে বিরক্তিকর হলো। তাকে দাদা বলবে কেন? বিজনেস করছে, বিজনেস নর্মস জানে না? তাকে তাদের ক্লায়েন্ট বানাতে চাইছে অথচ তাকে কীভাবে সম্বোধন করবে জানে না। সে কথাটি বলল গুছিয়ে। তাতে মেয়েটি বলল, স্যার আপনি যদি মনে করেন দাদা বললে আপনার অসুবিধে হবে, বলব না স্যার, আসলে জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের প্রতিষ্ঠান পারিবারিক হতে চায়। ক্লায়েন্ট তার বন্ধু। আত্মীয়। পরম নিকটজন। স্বজন, সুজন। সেই কারণেই ওইভাবে আমাদের কথা বলতে তারা ট্রেইন্ড। তুমি আমাদের একান্তজন ললিতদা, বউদি, ইফ ইউ মাইন্ড স্যার, ওভাবে বলা হবে না, ভুল করে বললেও তা ধরবেন না, অনেকদিনের অভ্যাস তো।

ললিত হাসতে হাসতে বলল, এইটা জানার জন্য সারাদিন ধরে ফোন করছ, আশ্চর্য!

কেন স্যার, মহামারি চলছে, যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে, বায়োলজিক্যাল ওয়ার, এখন প্রধান প্রশ্ন হলো, আপনি কেমন আছেন, আপনার পরিবার কেমন আছে?

ললিত বলল, ভালো যদি না থাকি, তোমরা কী করবে?

ভালো নেই স্যার, অধিকাংশ মানুষই ভালো নেই স্যার, মহামারিতে সমস্ত পৃথিবীই ভালো নেই স্যার, আমাদের প্রতিষ্ঠান ভালো রাখতে চায় মানুষকে, আমরা সেই কারণে নজরদারি করি, হেল্পলেস পিপলকে হেল্প করাই আমাদের মোটো স্যার।

ললিত বুঝতে চাইছে কীভাবে সাহায্য করবে? নজরদারি করতে হয় সাহায্য করতে? এদের চর আছে সারদা কলোনিতে? ললিত বলল, কীভাবে হেল্প করবেন?

সে স্যার আপনার সঙ্গে কথা বলে বলে বুঝব, আমরা মিসেস রায় মানে কণিকাদির সঙ্গেও কথা বলব।

তাঁর নাম্বার ? ললিত জিজ্ঞেস করে।

আছে স্যার ললিতবাবু, তাঁর সঙ্গে কথা বললে আমরা অ্যাসেস করতে পারব সবকিছু, মানুষের অসুখ যেমন অনেক রকম হয়, মানুষের আনহ্যাপি স্টেজ অনেক রকম হয়, বিমর্ষতা নানা কারণে হয়, মানুষ নিজেই বুঝতে পারে না সে কেন অসুখী, আবার বুঝতে পারলেও তার কিছু করার থাকে না, আমরা তাকে প্রটেকশন দেব।

ললিত বুঝতে পারছিল এই  টেককেয়ার এজেন্সি আটঘাট বেঁধেই নেমেছে। সে চুপ করে থাকল। কী বলবে বুঝতে পারছিল না। যদি সত্যিই এরা ফোন করে কণিকাকে, কণিকা তার মনের কথা কিছুই লুকোতে পারবে না। তার ফল কী হতে পারে?

সুলগ্না ডাকল, স্যার।

আপনারা আমার স্ত্রীকে ফোন করবেন না।

ভয় নেই স্যার, আমরা তাঁর বিমর্ষতা, বিষাদে প্রলেপ দেব শুধু, তাঁকে বোঝাব, দিস ইজ অবভিয়াস, এমন হবেই আধুনিক পৃথিবীতে।

তাঁর তো তেমন কিছু বলার নেই, আপনারা কথা তৈরি করে বলাবেন, আপনারা আমার ঘরের ভেতরে প্রবেশ করবেন না। ললিত ঈষৎ ক্রুদ্ধ গলায় বলল।

আহা তা কেন, যে সমস্যা আপনারা সলভ করতে পারছেন না, আমরা করে দেব। সুলগ্না বলে।

প্লিজ, আমাদের হেল্প লাগবে না, আর ফোন করবেন না।

সুলগ্না হাসল ফোনের ভেতরেই। হাসি রিনরিন বেজে উঠল ললিতের কানে। হাসতে হাসতে সুলগ্না বলল, আপনার রাগী ভয়েস দারুণ স্যার, ইউ আর আ হ্যান্ডসাম গাই, আপনি কথা বললে মনে হয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলছেন, আমরা জাস্ট কথা বলব।

এতে আপনাদের লাভ! আমার ছেলে বিদেশে থাকে, মা তার সন্তানের জন্য উতলা হবেই, তা নিয়ে তার সঙ্গে আপনারা খেজুরে গল্প করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।

স্যার, এইটাই এখনকার মূল অসুখ, একটিই সন্তান, সে বিদেশে চাকরি করে, আসে না, সব বড় বড় বাড়ি শূন্য পড়ে আছে, আপনি এক-একটা এলাকা দেখবেন, সল্ট লেক সিটি যান, দেখবেন, বৃদ্ধদের নগর, আমরা কত ফ্যামিলির পাশে দাঁড়িয়েছি, স্যাড অবস্থা তাঁদের, একটা বাড়ি দেখেছিলাম, বৃদ্ধ একা, তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে, কত বড় বাড়ি, ওপরে-নিচে ছয়টি ঘর, লিভিং-ডাইনিং, বাড়িটার দামই দু-কোটি টাকা, বৃদ্ধ বড় চাকরি করতেন, পেনশন পান, একা থাকেন, একটা লোক তাঁকে দেখে, কিন্তু সন্দেহজনক ব্যক্তি, এই সমস্ত ব্যক্তি মার্ডার হন, এই যে কাকুলিয়া রোডে হয়েছে কদিন আগে, আমরা এঁদের পাশে আছি।

পাশে থাকুন, কেউ বারণ করছে না, কিন্তু স্পাইং করবেন না, আমাদের নিজেদের মতো থাকতে দিন। ললিত বলল।

আরো ভালো থাকবেন স্যার, আপনাদের সমস্ত স্ট্রেস আমরা রিমুভ করে দেব।

ঠিক আছে, আমার আরেকটি ফোন আসছে, ছাড়ি। বলতে বলতে লাইন কেটে দেয় ললিত। আগে ইন্স্যুরেন্স এজেন্টরা খুব কথা বলত, এখন তাদের অতো বলতে হয় না। লোকে জীবন বীমা করে নিজে নিজে। অনলাইনেও করা যায়, আবার এজেন্ট এসে চেক নিয়ে যায়। টেককেয়ার এজেন্সির সুলগ্না কিংবা অন্য কেউ, ইন্স্যুরেন্স এজেন্টের চেয়েও তুখোড়, এতো কথা বলতে পারে, এতো রকমে বলতে পারে যে বিস্মিত হতে হয়। নীলার সঙ্গে কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল কণিকার। সে ব্যালকনিতে এসে বলল, অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলো কেন এতো, টাকা-পয়সা সব সাফ করে দেবে, এখন নীলাও সেই কথা বলল।

ছয়

ললিত বলল, ওটা একটা টেককেয়ার এজেন্সি।

কণিকা বলল, আমাদের দেশের ১৩০ কোটির ভেতরে তো ১০০ কোটিই হেল্পলেস, তাদের পাশে দাঁড়াতে বলো, রেললাইনে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিল কতগুলো লোক, ৫০০ মাইল হেঁটে ফিরছিল, তাদের পাশে দাঁড়াক না ওরা, আমরা ভালো আছি।

ললিত বলল, সরকার দাঁড়াতে পারছে না, একটা এজেন্সি দাঁড়াবে।

সরকার চেনে না দেশ তাই বুঝতে পারছে না কার পাশে দাঁড়াতে হবে, এরাও তাই, না হলে বলছে কেন হেল্পলেস পিপলের পাশে দাঁড়ায়?

ওরা ওদের সাধ্যমতো দাঁড়ায়।

এখন এই হয়েছে, চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, রাঙাদি বলছিল, চাঁদা তোলে হেল্পলেস পিপলের নাম করে, পুরোটাই গাপ করে দেয়, তোমাকে কিছু কন্ট্রিবিউট করতে বলেছে? কণিকা জিজ্ঞেস করল।

না, তা বলেনি। ললিত যেন জোর পায় বুকে।

এই যে এতো লোক কাজ হারিয়ে ছেলেমেয়ের পড়াশুনো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে, তাদের পাশে দাঁড়াতে বলো।

সে ওদের ব্যাপার, ওরা যা করবে করুক। ললিত যেন সুলগ্না এজেন্সির পক্ষেই সওয়াল করছে।

রাঙাদি বলল, ওদের ওখানে এক ভদ্রলোক লটারিতে ৫০ লাখ টাকা পেয়েছিল, সবটাই চ্যারিটেবল ট্রাস্ট করে দান করে দিয়েছে, যাতে দুঃখী লোককে সাহায্য করা যায়, ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছে ফেসবুকে, ইংরেজি-বাংলা খবরের কাগজে ছবি দিয়ে নিউজ হয়েছিল, সবটাই প্রচার, কেউ এক পয়সাও পায়নি, ট্রাস্টি সব নিজের – দুই ছেলে, দুই মেয়ে, জামাই, নিজের শালি, স্ত্রী, নিজে, মানুষ এমনি হয়ে গেছে, তোমাকে তো দান করতে কেউ বলেনি, লটারি পেয়েছ, ট্যাক্স দিয়ে টাকা এনজয় করো, কিন্তু নাম কিনতে হবে যে। বলতে বলতে কণিকা উত্তেজিত হয়ে গেল, পৃথিবী থেকে দয়ামায়া উঠে গেছে।

ললিত বলল, তা যেমন সত্যি, আবার তা সত্যিও নয়।

কণিকা বলল, ফোনে বেশিক্ষণ কথা বলতে বলতে তুমি বুঝতেই পারবে না, ওরা ফোনের সব কপি করে নিচ্ছে, তুমি জানতেও পারবে না, টাকা সাফ করে দেবে কখন, ফোনের সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লিংক করে এই লাভ হয়েছে।

হুঁ, কিন্তু ঠিক এইভাবে করতে পারে না। ললিত সমর্থন করেও কণিকার ভয় দূর করতে চাইল।

কীভাবে কী হবে তা কি আমরা জানি, এসব জামতাড়া গ্যাং, নানা ভেক ধরে আসে।

কণিকা সারাদিন মোবাইলে ইন্টারনেট ঘেঁটে কত কিছুই না জেনেছে। এর ওপরে খবরের কাগজ আট ঘণ্টা বাদে হাতে ধরেও জেনেছে কম না। ঝাড়খণ্ডের জামতাড়ার একদল চিটিংবাজ মোবাইল ফোনের ডিটেইল, অ্যাকাউন্টের ডিটেইল জেনে নিয়ে ইন্টারনেট ব্যাংকিং করে জমা টাকা তুলে নেয়। ললিত ভাবল, সুলগ্না টেককেয়ার এজেন্সি কি তাই করবে? ললিতের নানা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে। এটা করেছে সে তার টাকা বাঁচাতে। এক ব্যাংক ফেল মারলে পাঁচ লাখের বেশি পাবে না মানুষ। তাই নানা ব্যাংকে টাকা রাখা। ললিতের নিজস্ব ডায়েরিতে সব লেখা আছে ব্যাংক ধরে ধরে। সেই ডায়েরির কথা সে আর কণিকা জানে। ব্যাংকের কাগজপত্র, পাশ বই, চেক বই, বিভিন্ন এটিএম কার্ডের পাসওয়ার্ড সব লেখা আছে তাতে। টেককেয়ার এজেন্সির সঙ্গে এসব নিয়ে কথা হয়নি।

ললিত মৃত্যুসংবাদ দিলো। বরুণ দত্ত কীভাবে মারা গেছে সেই কথা বলল। শুনতে শুনতে কণিকা বলল, লোকটার নিয়তি এই লিখে ছিল, অতো দুশ্চরিত্র মানুষের এই-ই হয়।

হুঁ, অন্যায় করতে করতে মানুষ অকুতোভয় হয়ে যায়, ভাবে, সে-ই সব, মানুষের জীবন একটু স্বাভাবিক হতে হয়, অস্বাভাবিক জীবন টেকে না, এই মৃত্যু ছিল অবধারিত, মেয়েরাও শোধ নিতে জানে, শোধ নিয়েছে নেপালি মেয়েটা। কণিকা ক্রুদ্ধ গলায় বলল।

বন্দনা বউদি এবার যদি ফ্যামিলি পেনশন পায়, কী অন্যায় না করেছিল বরুণ।

শয়তান ভর করলে এমন পারে। বলল কণিকা, পাপ, পাপের একটা প্রতিক্রিয়া আছে, তুমি যেমন জীবন কাটাবে তেমন ফল পাবে।

ললিত চুপ করে থাকল। কথাটা অসত্য নয়। ললিতের অকালপ্রয়াত বন্ধু দেবব্রত অত্যধিক মদ্যপান করে লিভার নষ্ট করে ফেলেছিল। বাঁচেনি বেশিদিন। কিন্তু তা পাপ নয়। একটু রয়েসয়ে নেশা করতে হয়, আর একজন নিজে ড্রাইভ করছিল চুর হয়ে। ট্রাকের মুখোমুখি হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গিয়েছিল উত্তম চৌধুরী। বলে, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলাম ললিত। কী ভয়ানক তার চেহারা। আতঙ্কের রকম বোঝাতে পারব না। তারপর সে মদ ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তাও পাপ নয়, অতো জোরে ছুটতে নেই, জীবন যেটুকু অনুমোদন করে সেটুটুকুতে সন্তুষ্ট হতে হয়। কিন্তু এই কথারও বিপরীত কথা আছে। অতো পুতুপুতু করে চললে, জীবন চেনা যায় না। ভোগ করতেই তো জন্ম নেওয়া। একবারের বেশি তো জন্মাবো না। হিসাব করতে নেই অতো। ঝুঁকি নিতে হয়। ঝুঁকি নিলেই জীবনের স্বাদ টের পাওয়া যায়।

কণিকা বলল, রাঙাদি বলল, তার ছেলের বউ তাকে অপমান করে গেছে।

তপন তো, ডিভোর্সের পর দ্বিতীয় বিয়ে তো হতেই পারে।

রাঙাদি প্রথমে আগের বউকে সমর্থন করেছিল।

করবেই তো, জানি, বউটা ভালো ছিল। ললিত বলল।

পরে রাঙাদি পিছিয়ে এসেছিল ওদের ভেতর মিল হবে না দেখে, কিন্তু নিজে মেয়ে হয়ে আরেকটা মেয়ের জীবন নষ্টে কেউ সমর্থন করে?

ললিত জিজ্ঞেস করে, এইসব কথা হচ্ছিল?

হ্যাঁ, ওর তো কম দুঃখ না, তারা মানে সেই ননদের ছেলে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেই না, মদদ দিয়েছে বাবুইয়ের বউকে, তাকে বিষিয়ে দিয়েছে যাতে রাঙাদিকে অপমান করে ভালো রকমে।

ললিত জিজ্ঞেস করে, তোমাকে বলল?

হ্যাঁ বলল, কার কাছে বলবে?

দুঃখী খুব তোমার দিদি। ললিত মন্তব্য করল।

হুঁ, সংসার খুব ভালো না, রাঙাদি খুব পড়ে, রাশিয়ান নভেলের কথা বলছিল, তিন ভাই, প্রেম, পাপ-পুণ্যর কথা, তুমি পড়েছ? কণিকা জিজ্ঞেস করে।

কারামাজভ ব্রাদার্স।

হ্যাঁ, সেই সব পাপ টিকে আছে, পুণ্য মুছে গেছে। কণিকা বলল।

ললিত বলল, পাপ-পুণ্য বলে কিছু নেই, সবই পাপ, সবই পুণ্য, শব্দদুটিই ভুল মনে হয়।

কেন তা হবে? কণিকা মাথা নাড়ে, আছে, আছে বলেই সূর্য উঠছে।

সূর্য ওঠে জাগতিক নিয়মে, তুমি যাকে পাপ বলো, আর কারো কাছে তাই-ই পুণ্য, নাৎসিরা ইহুদিনিধন পুণ্য বলে মনে করেছিল, তাই পেরেছিল, না হলে গ্যাস চেম্বারে অতো হত্যা সম্ভব হতো না।

অতো জানি না, কিন্তু রাঙাদি খুব দুঃখে আছে।

ললিত ভাবল, সুলগ্না টেককেয়ার এজেন্সি এই খবর জানে না এখনো, জানলেই পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। তখন ফোন এলো গৌতমের। গৌতমের আবার ফোন মানে আবার কেউ অসুস্থ, অথবা চলে গেছে। চলে যাওয়ার পর বোঝা যায় তার করোনা জ্বর হয়েছিল। কিংবা হার্ট অকেজো ছিল। সেরিব্রাল হয়েছিল। গৌতম বলল, না, ললিতদা, আমি এখন ফেসবুকে লিখি, ফোন করে মৃত্যুসংবাদ দিই না, জিতেনদারটা ব্যতিক্রম হয়েছিল, আপনার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল তো, একটা অন্য খবর দিচ্ছি, ভালো খবর, বরুণদার কথাটা মিথ্যে, বেঁচে আছে।

হাসপাতালে? ললিত জিজ্ঞেস করল, কতটা ইনজুরি?

গৌতম বলল, না না না, অমন কিছু ঘটেনি।

তাহলে তুমি যা শুনেছিলে, সত্যিই মিথ্যে?

হ্যাঁ ললিতদা, কথাটা কেউ রটিয়ে দিয়েছিল।

তার মানে কুকরি দিয়ে কোপায়নি?

না, কিছুই ঘটেনি তেমন। গৌতম বলল।

যা রটে তার কিছু তো বটে।

গৌতম বলল, না, কিছুই ঘটেনি, কেউ মৃত্যুসংবাদ রটিয়ে দিয়েছিল, জেনেশুনে রটিয়ে দিয়েছিল।

আশ্চর্য, খারাপ সংবাদ, মৃত্যুসংবাদ কখনো মিথ্যে হয় না।

ললিতদা, আমি একটু আগে বরুণদার সঙ্গে কথা বললাম, বরুণদা বলল, আয়ু বেড়ে গেল এতে, হাসছিল।

বরুণের সঙ্গে কথা বললে, তুমি! আশ্চর্য, মৃত্যুসংবাদ কার মুখে শুনেছিলে?

কালি ও কলম

তুমি বলছ সসীম রটিয়েছে?

না ও শুনেছিল তাই বলেছিল।

ললিত জিজ্ঞেস করে, ওকে বলল কে?

তা ও বলছে না, কিন্তু ওকে একজন বলেছে বলেই ও খবরটা শ্যামলকে দিয়েছে, জিজ্ঞেস করেছিল মারা গেছে কি না বরুণ দত্ত, ওর দুঃসম্পর্কের আত্মীয়।

চুপ করে থাকে ললিত। ভুয়ো মৃত্যুসংবাদ রটিয়ে দেওয়া যায়? তিনদিন ধরে মৃত্যুসংবাদ ঘুরেছে নানাজনের কাছে।

কথাটা কি প্রথমে বরুণই রটিয়ে দিয়েছিল। বরুণ নিজের মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে দিয়ে মজা লুটেছিল। তা হবে কী করে, বরুণ দত্ত কি ফোনে বলেছিল, আমাকে কুপিয়েছে আমার সেকেন্ড ওয়াইফ, নেপালি বউ?

আচ্ছা, কে রটাল? বিস্মিত ললিত জিজ্ঞেস করে।

ধরা যাচ্ছে না, এখন বরুণ দত্তর কাজ হয়েছে জনে জনে ফোন করে বলা সে বেঁচে আছে, তার বউ মালা সিনহার মতো সুন্দরী, বউকে সব উইল করে দেবে এবার, আলিপুরদুয়ারের বাড়ি, ব্যাংকের টাকা, চা-বাগানের শেয়ার। বরুণ বলেছে, জনে জনে ফোন করে প্রমাণ করতে হচ্ছে সে বেঁচে আছে।

তার মানে? গৌতম বরুণকে জিজ্ঞেস করেছিল, এইরকম খবর কেউ রটাতে পারে?

বরুণ বলেছে, পারে, ঈর্ষায়, বিদ্বেষে পারে, আমার নিকটজন রটিয়েছে, এখন জনে জনে বলতে হচ্ছে কী করে আমি বাঁচলাম।

তোমার নেপালি বউ কী বলছে?

বরুণ বলেছে, কাঁদছে, কেঁদেই যাচ্ছে, বলছে হামি তুমাকে মারার আগে নিজে মরব পতি।

গৌতমের ফোন শেষ হতে ললিতের মনে হলো, বরুণকে ফোনে ধরে। নাম্বার নিল গৌতমের কাছ থেকে, তারপর দূর আলিপুরদুয়ারে, ভুটান পাহাড়ের কোলে ফোন করল। ভুটান পাহাড় অন্ধকারে ডুবে আছে। আকাশে কত তারা, তারারা ভুটানের আকাশে না ভারতের আকাশে, বরুণ তা জানে না। কলকাতা ছেড়ে এসেছে চিরকালের মতো। রু´ নীর সঙ্গে তার আলাপ এখানে বদলি হয়ে এসে। তখন সে পঞ্চাশ পার। রু´ নীর বছরতিরিশ। বিয়ে হয়েছিল ফুন্ট সোলিংয়ে। বছর পাঁচ বাদে স্বামী তাকে খেদিয়ে দিয়ে একটি ভুটানি মেয়েকে নিয়ে থিম্পু চলে যায়। রু´ নী রূপবতী। মালা সিনহা অবিকল। সাথিহারা সিনেমার মালা সিনহা। বরুণ ললিতেরই সমসাময়িক। ললিতকে সে বলল, যে রটিয়েছে, ভালো করেছে, আমার আয়ু বেড়ে গেল, আরে ললিত, কতবার বলেছি আয় একবার, বাড়িতে দুজন বসে বসে কী করিস?

ললিত জিজ্ঞেস করল, কে এসব রটাল, তুই কি থানায় জানিয়েছিস?

থানা গুজবের বিরুদ্ধে কি অ্যাকশন নেয়?

ললিত বলল, থানা ঠিক বের করে ফেলবে গুজবের উৎস কোথায়?

কী হবে কাদা ঘেঁটে, আগের পক্ষ তো চায় আমি মরি, কিন্তু মরলেও পাবে না, সব উইল করে রাখছি, আই লাভ রু´ নী।

ললিত বলল, তাকে কি ডিভোর্স দিয়েছিস?

দিয়েছি, একতরফা হয়েছে জলপাইগুড়ি কোর্টে।

সে তো কলকাতায় থাকে।

সে যেখানে খুশি থাকুক ললিত, আমি কাগজে-কলমে ডিভোর্স নিয়েছি, তারপর বিয়ে করেছি, রু´ নী আমার যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছে।

একটা সময় থামতে হয় বরুণ।

বরুণ বলল, থেমেছি তো, ভুটান পাহাড়ের মতো থেমেছি।

চুপ করে থাকল ললিত। বরুণের বয়স বরুণকে দমিয়ে দিতে পারেনি। মৃত্যুসংবাদ সে উপভোগ করেছে। বলল, ললিত, কলকাতায় থেকে কী হয়, চলে আয় দুজনে, ব্যালকনিতে বসে ভুটান পাহাড় দেখবি, চমৎকার শীত, চমৎকার বর্ষা, আরম্ভ হলে আর থামতে চায় না, তোর বয়স থেমে যাবে, বয়স পেছনে হাঁটবে, আয় চলে আয় আমার কাছে।

এমনই ডাকল বরুণ যেন ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে ধেয়ে এলো সেই কণ্ঠস্বর।

কণিকা তখন বলল, জিজ্ঞেস করো তো বন্দনার কীভাবে চলে?

হ্যাঁ গেছে, যে-সম্পর্কে ভালোবাসা নেই, আস্থা নেই, তা না থাকাই ভালো।

ললিত আর বেশি সময় কথা বলতে পারল না। কণিকা রেগে যাচ্ছিল। কিন্তু ফোন ছাড়ার আগে শুনল, তার মৃত্যুসংবাদ তার বউ বন্দনা রটিয়ে দিয়েছিল ফোনে ফোনে। সতীন নেপালি মেয়েটি তার স্বামীর স্বভাবের কারণে কুপিয়েছে। রটিয়ে কী হলো? সে কি মরে গেল? যাকগে ভালোই হয়েছে, মাইরি কেউ তো ফোন করে না, কতদূর একা পড়ে আছি, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি মনে হচ্ছিল, এতে আবার চাঙ্গা হয়ে গেছি, বউয়ের কান্না

থামাচ্ছি, বউ বুড়ি হয়নি  রে, একেবারে মালা সিনহার মতো দেখতে রে, তোর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে বউয়ের ছবি দেব?

সাত

সকালে ললিত বেরিয়েছিল মাস্ক পরে, মাথায় কভার লাগিয়ে। ভালো চা আর বিস্কুট চাই। একটু হেঁটে মোড় অবধি যেতে হয়। রাস্তায় লাঠিতে ভর দেওয়া এক বুড়ি থাকে। ময়লা নাইটি পরা। পায়ে একটা হাওয়াই চটি। মাস্ক নেই। ললিতকে দেখে বুড়ি চঞ্চল হয়ে যায়। এগিয়ে এসে তাকে প্রায় আটকে দেয়। কারণ তাকে ললিত কিছু দেয়। পুজোর সময় একদিন মিষ্টির দোকান থেকে দই-সন্দেশ কিনে ঘুরে দাঁড়াতে বুড়িকে হাত বাড়ানো দেখে সে দশ টাকার একটি নোট দিয়েছিল। তারপর দেখা হলে পাঁচ-দশ টাকা দেয়। আজ দশ টাকা দিলো। দিতে দিতে ভাবল, সুলগ্না এজেন্সি এদের সাহায্য করতে পারে। এবার ফোন করলে বলবে।

বাড়ি ফেরার পর বেলা ন-টা নাগাদ ডোরবেল বাজল। বাজার কথা নয়। এখন তো কেউ আসে না। তবে ফেরিওয়ালা আসে। নানারকম লোক বাড়ির সামনে হাজির হচ্ছে। কয়েকদিন আগে এক শীর্ণকায় ব্যক্তি হাজির দরজায়। বাজার করে দেবে, দোকানপাট করে দেবে। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড অরিজিনাল এবং ফটোকপি এনেছিল সঙ্গে। লোকটার বয়স তারই মতো হবে। রবিন মণ্ডল নাম। টিটাগড় গ্লাস ফ্যাক্টরিতে কাজ করত। বন্ধ হয়ে গেছে। বাঁচতে হবে তো। ললিত না করে দিয়েছে। একদিন এলো ঝুরো মাছ নিয়ে একজন। এক বৃহস্পতিবার ফুলের ঝাঁপি নিয়ে একটা লোক। আজ আবার কে এলো?

ললিত মাস্ক মুখে লাগিয়ে নিচে নেমে দরজা খুলল। দেখল অচেনা এক মধ্যবয়সিনী। মুখে সার্জিক্যাল মাস্ক, কিন্তু তা নেমে এসেছে থুঁতনির কাছে। পিছিয়ে এসে ললিত বলল, মাস্ক মুখে তুলুন।

তিনি টেনে দিয়ে বললেন, খুঁজে খুঁজে এসেছি দাদা, আপনার বাড়ি কাজ করে যে রুকসানা মাসি, সে পাশের পাড়ায় ২৩ নম্বর বাড়ি কাজ করে, সেই বাড়িতে করোনা হয়েছে, ওরা কি ওকে বলেনি? ও কি জানে না, ওকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে, না হলে বেতন দেবে না, সামনে ওদের পরব, তাই করছে বলল, আপনারা ওকে বন্ধ করুন, নাহলে রোগ ছড়িয়ে পড়বে, আপনারা দুজন বুড়ো মানুষ, জ্বররোগ ধরে গেলে কী করবেন, ছেলে ফরেনে থাকে শুনেছি।

রুকসানা মাসি হলো ঠিকে কাজের লোক। তাদের বাসন মাজে, ওপর-নিচ ঘর পরিষ্কার করে, মোছে। থাকে বড় বস্তিতে। তার স্বামী নাজির মহম্মদ এক-একদিন পেছনের বাগান পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। এ-কাজটি ললিতই করত। কিন্তু নাজিরের ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে নানারকম কাজ করে দু-পয়সা উপার্জনের চেষ্টা করছে। ললিত বলেছে, তুমিই করো, মাসে দুদিন এসে বাগান, বাড়ির পাখা, বুকসেলফ ধূলিমুক্ত করে যেও। তাই চলছে। রুকসানা মাসি সকাল থেকে অনেক বাড়ি কাজ করে বেড়ায়। ঠিকে। তার টুকটাক দোকান-বাজারও করে দেয়। হিসাবে দড়। ভুল করে না। আজ মাসি এসে চলে গেছে। আর একটু বেলায় আসবে। এসে সকালের টিফিন নিয়ে যাবে। রুটি-তরকারি। সকালে চা-বিস্কুটও পায় এখানে। মহিলা কথাটি বলে অন্তর্হিত হলো। রুকসানা মাসি সারদা কলোনির ১৪নং বাড়িতে কাজ করে। ১৪নং বাড়ির দত্তরা তিনদিন আগে ওকে বন্ধ করে দিয়েছে। বলেছে, এখন রোগের প্রকোপ বাড়ছে, কমুক তারপর এসো। রুকসানা সেদিন বিমর্ষ গলায় বলেছিল, পরবের সময়, কাজ গেল।

ললিত বুঝতে পারল, তারা হয়তো খবরটি পেয়েই ওকে বন্ধ করেছে। তাই যদি হয়, তবে তাকে জানায়নি কেন? আজই বাজারে দেখা হলো, হাত নাড়ল, কিন্তু কথাটি বলল না। ললিত জিজ্ঞেস করেনি, কেন বন্ধ করেছে। এই নিয়ে গত বছর তর্ক হয়েছিল। প্রদীপ দত্ত এবং তাঁর পরিবারের ধারণা, এইসব কাজের লোক রোগের ডিপো। তারাই ছড়াচ্ছে ভাইরাস। কিন্তু সত্যটা অন্য। বরানগর বস্তি, আশপাশের যে ছোট বস্তি রয়েছে, বাড়ি বাড়ি, ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে কাজের লোক আসে যেখান থেকে সেখানে কিছুই হয়নি। গত বছর। ইমিউনিটি হোক, যা কিছু হোক তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দত্ত পরিবার তাদের সিদ্ধান্তে অনড়।

মহিলা চলে গেলেন। গেট বন্ধ করে ললিত ওপরে উঠে এলে কণিকা সব শুনে বলল, তাহলে কদিন ছুটি দেওয়া হোক মাসিকে,

কোয়ারেন্টাইনে যাক ম্যাস।

ললিত বলল, দত্তরা ছেড়েই দিয়েছে, হতেই পারে, কিন্তু আমাদের জানাল না, আমাদের হলে ওদের হতে কতক্ষণ?

তারা অপেক্ষা করতে লাগল। মাসি আসবে। মাসি এলো। কিন্তু নিচের গেটে তালা বলে ঢুকতে পারল না। এবার দুজনেই নিচে নেমে এলো, কথাটা কণিকা তুলতে রুকসানা মাসি বলল, না বউদি, আমি যাইনি আজ, বন্ধ করে দিয়েছি।

কণিকা বলল, তুমি বলোনি কেন আমাদের?

বলিনি, আমার তো কিছু হয়নি বউদিদি।

তোমাকে দত্তরা তিনদিন আগে ছেড়ে দিলো কেন?

আমরা কি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম আগেরবার?

না, বেতন পেয়েছিলাম।

তবে তুমি করোনার কথা বলোনি কেন?

না কাম করে বেতন নিতে লজ্জা হয় বউদি।

ললিত বলল, মাসি, আমাদের যদি হয়ে যায়?

হবে না, আমি তো ওদের বাড়ি কাজ করলাম, হয়নি। রুকসানা বলল।

তোমার হয়েছে কি না তুমি জানো না, শোনো দশদিন বাড়ি থাকো, যদি সুস্থ থাকো, আসবে।

মাসির মুখখানি করুণ হয়ে গেল। চোখ চিকচিক করতে লাগল, বলল, আগেরবার মাসে মাসে বেতন নিলাম, কামকাজ কিছু করিনি, পুজোর সময় ডবল দিলে, দাদা, এবার কাজ করতে দাও।

কণিকা বলল, তুমি আপাতত দশদিন বাড়িতে থাকো, তারপর এসো।

দশদিন বাড়ি থাকলে পেট চলবে কী করে বউদিদি, তিন বাড়ি বাজার করে দিই, আরো দু-বাড়ি কাচাকুচি করি, সারাদিন কামেই থাকি বউদিদি।

বাধ্য হয়ে টিফিন নিয়ে চলে গেল রুকসানা মাসি। ললিতা বলল, পাঁচজনে একটা ঘরে থাকে, ওর যদি হয়ে যায়, তবে কী অবস্থা হবে, ওর মেয়ের বাচ্চা আছে তিন বছরের।

রুকসানাকে ছাড়বে কি ছাড়বে না, তা বুঝতে পারছে না ললিত। তাকে বন্ধ করে দেওয়া মানে অশ্রুর ওপর চাপ। অশ্রু করতে চাইবে না। এখন মাঝে মাঝে বলে ফিরে যাবে ভাইদের কাছে। ব্যাংকে তার কম জমেনি। এছাড়া বিধবা ভাতা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ইত্যাদি সরকারি প্রকল্প হয়েছে। সেসব পেলে তার আর এখানে পড়ে থেকে কী হবে? সে চলে গেলে কে সাহায্য করবে? কেমন যেন অসহায় লাগছে নিজেকে। সময় খারাপ নিশ্চয়। দত্তদের বাড়ি যে রান্না করত, তার বাড়ি বারুইপুর। তার ছেলেমেয়ে, স্বামীর করোনা হয়ে যাওয়ায় চলে গেছে। আর ফেরেনি। সে যাতায়াত করত। সকালে এসে চার বাড়ি রান্না করে ফিরে যেত দুপুর নাগাদ। ফোন করে বলেছিল আর আসবে না। দত্ত মশায় নতুন লোক পেয়েছেন অনেকদিন বাদে। করোনায় বেকার স্বামী। বউ রান্না করতে বেরিয়েছে।

তখন ফোন এসে কেটে গেল। মানে সিগনাল দিলো। তুমি রেডি হও, আমি আসছি। ললিত দেখল অচেনা নাম্বার। সে অপেক্ষা করতে লাগল। ভুয়ো ফোন, কোম্পানির ফোন, কতরকম ফোন সারাদিন আসে। তার কোনো একটি অথবা ব্যাংক জালিয়াতের ফোন হতে পারে। আপনার অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে, আপনার ডেবিট কার্ডের নাম্বার ...। ফোনটি বাজল, একটি নরম পুরুষ কণ্ঠ শুনল ললিত, খুবই বিনীত। তিনি বললেন, নমস্কার স্যার, আমি কি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?

বলুন। ললিত নরম গলায় বলল।

আমাদের প্রতিনিধি আপনার কাছে যাবে, আপনার কোন ঘরটি পছন্দ জানাবেন, নদী পছন্দ করবেন জানালা দিয়ে দেখতে অথবা বাগান, হাইওয়ে।

মানে? ললিত অবাক হলো, এসব কথা কে বলেছে? সে তো বেশ আছে। ভালো আছে।

না, সমস্যায় পড়েছেন, সমস্যা আরো বাড়বে, আমাদের প্রতিনিধি গত কয়েকদিন আপনার সঙ্গে কথা বলেছে, হিসাবে তা আট ঘণ্টা। নানা কথা হয়েছে। আপনাকে আমাদের পছন্দ হয়েছে, আপনি খুবই কোঅপারেশন করেছেন আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে, তিনি আপনার প্রবলেম জেনেছেন।

আপনি কি সুলগ্না ...।

ইয়েস স্যার, আমি সুলগ্না টেককেয়ার এজেন্সি থেকেই বলছি, আপনি যে প্রেয়ার দিয়েছিলেন, আমরা যা বুঝেছি আপনার কেয়ার

নিতে হবে আমাদেরই, করেছিলেন, আপনারা একা, আপনাদের পুত্র বিদেশে, কবে ফিরবে ঠিক নেই, কাজের মেয়েটি মুসলিম, না রাখাই ভালো, আর পুরনো যে বুড়ি রয়েছে, সে চলে গেলে কী হবে, যেতেই পারে, আমাদের এজেন্সি এমনি একা মানুষদের কেয়ার নেয়, শেষ বয়সে কেয়ার নেওয়ার লোক চাই, হেল্পলেস লোককে হেল্প করাই আমাদের ব্রত।

না দরকার নেই, প্লিজ আপনারা ফোন করে করে বিরক্ত করবেন না।

আমাদের রেকর্ড বলছে স্যার, আমাদের সার্ভে বলছে আপনারা একা, সারাদিন একা বসে থাকেন, আপনাদের পরস্পরের ভেতর কথা বলাও শেষ হয়েছে ...।

না আমরা প্রচুর কথা বলি। ললিত রেগে গেল।

বলেন না, আমরা তা জানি, দুটি কাজের লোক চলে গেলে কী হবে জানেন?

ললিত বিরক্ত হয়ে ফোন কেটে দিলো। কিন্তু তার গা ছমছম করতে লাগল। সত্যিই তো। সারাদিন যে বসে কণিকা ফোন ঘাঁটে, তার ভেতরে এমন কোনো অ্যাপে ক্লিক করেছে কি না যাতে এমন একটি প্রার্থনা কারো কাছে চলে যায়। সে ভাবতে লাগল। সমস্যা কঠিন মনে হচ্ছে। এমন কি হতে পারে তাদের পুত্র আছে এই এজেন্সি নিয়োগের পেছনে? সে তার দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে।

বিদেশে থেকে সে কবে আসবে ঠিক নেই। ভাইরাস ঘুরে আসছে। ভোট চলে গেলে আক্রান্তর সঠিক হিসাব আসবে। তাহলে কি তার পুত্র এমন ব্যবস্থা করেছে এজেন্সির সঙ্গে পরামর্শ করে। বাবা-মা নিয়ে তাহলে তার দায় চলে যাবে। এটা কোনো বৃদ্ধাবাস হতে পারে, বা নতুন এক সিস্টেমের এজেন্সি। মানুষের নিরাপত্তা দেয়। বিনিময়ে তারা তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, টাকা-পয়সা – সব দেখাশুনো করবে। আসছে তারা, আসছে। গুম হয়ে বসে থাকল ললিত। ভাবল, গৌতমকে একবার জানায়। গৌতমকে ফোনই করল ললিত। গৌতম বলল, তার কাছেও ফোন এসেছিল, সে বলেছে তার প্রচুর কাজ আছে, সকালে বাগানে মাটি কোপায় ঘণ্টাদুই। শুনে তারা বলেছিল, মাটি তারাই কুপিয়ে দেবে। গৌতম ফোন কেটে দিয়েছে। ললিতের মনে হতে লাগল তারা আসবে তার সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু সে কথা বলবে কেন, ভেতরে ঢুকতে দেবে কেন? ঘরে ঢুকে ঘরের ছবি তুলে নেবে। তাদের ছবি তুলে নেবে, তা ভালো হবে না।

তখন আবার ফোন বাজল, ২৩ নাম্বার বাড়ির প্রদীপ দত্ত, বলল, বাদ দিয়ে দিলেন তো রুকসানাকে?

আপনি বাদ দিয়েছেন? ললিত জিজ্ঞেস করল।

আমি তো তিনদিন আগে। দত্ত বলল।

কেন বাদ দিলেন?

পাশের পাড়ায় যে বাড়িতে করোনা হয়েছে, সেই বাড়িতে কাজ করে রুকসানা।

ললিত বলল, আমি তো জানি না।

সে কি আপনি জানেন তো।

কে বলল, আপনার সঙ্গে কি দেখা হয় না, বলেননি তো। গলায় উষ্মা এনে বলল ললিত।

প্রদীপ দত্ত বলল, রুকসানা বলেছিল, আপনারা রেখেছেন সব জেনেও, সে মাস্ক পরে কাজ করে আসে।

রুকসানা বলেছিল আমরা জানি?

তাই-ই তো। প্রদীপ বলল, যাকেগ, ছেড়ে দিয়েছেন তো, আর ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেবেন না।

ললিতের রোখ চেপে গেল, ছাড়িনি তো, কোয়ারেন্টাইনে যেতে বলেছি, বাড়িতে দশদিন থাকবে, তারপর আসবে।

প্রদীপ বলল, আমরা অন্য লোক দেখে নেব, ওকে লাগবে না আর, কিন্তু আপনি ওকে আবার নেবেন, যত ভাইরাস ওরাই ক্যারি করে।

একদম ভুল, এই রোগ সুখী মানুষের। বলতে বলতে ফোন কেটে দিলো ললিত। কণিকাকে বলল, রুকসানা নিয়ে যত সমস্যা দত্তর, যে মহিলা এসেছিল, তাকে মনে হয় দত্তই পাঠিয়েছিল।

আট

বেলার দিকে আবার ডোরবেল বাজল। কে এলো? নিচে নেমে এলো ললিত। ললিত বেরোবে ভাবছিল তাই নামা। অশ্রুমতী দরজা খোলে না। তাকে বারণ করা আছে। বৃদ্ধা। সে কোনো বিপদ রুখতে পারবে না। এমনিতে এখন কুরিয়ার ছাড়া কেউ আসে না। ললিত দরজায় গেল, দেখল সেই মহিলা যে রুকসানা মাসির খবর দিয়েছিল, আবার এসেছে। বলল, দাদা, আমাকে নীলম বলেছে কথাটা, ১৭ নম্বর বাড়ির মেয়ে, আমি ওদের বাড়ি বাসন মাজি, রুকসানা এখন বলছে, আমি আপনাকে কেন বললাম, আমার কী দরকার ছিল, আমাকে গালি দিচ্ছে।

আপনার নাম কী? ললিত জিজ্ঞেস করল।

আমাকে লক্ষ্মীদি বলে সবাই চেনে, লক্ষ্মী দাসী, জয়নগর বাড়ি, আমি মন্দিরের ওদিকের বস্তিতে থাকি, রুকসানা আমাকে পথে ধরেছিল, আমি কেন বললাম।

কেন বললেন?

যদি রোগ ছড়িয়ে যায় নীলম আমাকে বলতে বলল।

নীলম কে? ললিত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

১৭ নম্বর বাড়ি, যেখানে আমি বাসন মাজি, ওদের কাপড়ের ব্যবসা বড় বাজারে, বলবেন সস্তায় প্যান্টের পিস, শার্ট এনে দেব। লক্ষ্মী দাসী বলল আগ্রহ জাগাতে।

ললিত বলল, আমি তো রুকসানাকে ছাড়িনি, দশদিন বাড়িতে থাকতে বলেছি, কোয়ারেন্টাইন, না হলে কোভিড টেস্ট করিয়ে ঢুকিয়ে নেব।

ছেড়েই তো দেবেন দাদা, রুকসানা নীলমের বাড়িতে কাজ করত, অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছে, বহুত নোংরা মেয়ে, ঝগড়া করে, তার ওপর মুসলিম আছে। লক্ষ্মী দাসী বলল।

আমি তো এসব জানি না, ভালো মনে হয়।

লক্ষ্মী দাসী বলল, ওকে দিয়ে কি পুজোর ফুল আনাতে পারেন?

পারি, ফুলের কি জাত-ধর্ম যায়? কথাটা বলে ললিত বুঝল, এসব একে বললে বুঝবে?

ধর্ম তো মানতে হবে দাদা, গরমেন বলছে ধর্ম মানতে, তার ওপর ও চোর আছে।

কার বাড়ি চুরি করল, আমাদের বাড়িতে তো নয়।

লক্ষ্মী দাসী বলল, অনেকে বলে ওর হাতটান আছে, নীলমের ঠাকুমার কত টাকা নিয়েছে।

আমাদের তা মনে হয়নি একদিনও।

লক্ষ্মী দাসী বুঝল কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। চুরি, গরমেন, মুসলমান, পুজোর ফুল ... সব ব্যর্থ হলো। সে প্রসঙ্গ বদল করে দিলো, বলল, খুব ভালো লোক আছে, নেবেন?

কে সে? ললিত এতক্ষণে এই লক্ষ্মীদি, কিংবা লক্ষ্মী দাসীর আসার উদ্দেশ্য বুঝতে পারল।

বহড়ুর মেয়ে, স্বামী কাজের খোঁজে গিয়ে আর ফেরেনি, মেয়েটা কাজ করতে এয়েছে কলকাতায়, একটা পেয়েছে, আরো দরকার, বাচ্চা আছে, ইস্কুলে ভর্তি করবে। লক্ষ্মীদি বলল, চাদ্দিকে জ্বর চলছে, তাতেই লোকের কাজ নেই কত।

না, আমার তো রয়েছে লোক। ললিত বলল।

আমি যে তাকে বলে দিয়েছি আপনি নেবেন, মুসলিম রাখবেন না হিন্দু পেলে।

আশ্চর্য! নেমে এসেছে কণিকা, পেছন থেকে এতোক্ষণে বলল, আমরা কি বলেছি লোক নেব?

কিন্তু রুকসানাকে রাখবেন কেন, নোংরা, দত্ত বউদিকে জিজ্ঞেস করেন, মুখরা আছে, চোর আছে। লক্ষ্মীদি বলল, এই বাড়িতে আর ঢুকতে দেবেন না, মুসলমান রোগ ছড়ায়।

ছড়াক রোগ। রেগে যায় কণিকা, আমরা রেখেছি আমাদের ইচ্ছেয়।

রুকসানা আমাকে খারাপ খারাপ কথা বলল, রোজা চলছে, রমজান মাস, তার কাজ খেয়েছি আমি, ভালো হবে না আমার, কিন্তু মুসলমানের অভিশাপে হিন্দুর কী হবে, কোনো বাড়ি যদি করোনা হয়, তুমি সেখানে রোজ কাজ করতে যাবে, আমি বলব না?

লক্ষ্মী দাসী চলে গেল একটু মন খারাপ করে। ললিত বলল, ওর কাজ খেয়ে নিয়ে নিজেরা ঢুকবে, খুব খারাপ।

কণিকা বলল, রুকসানার কোভিড টেস্ট করাও, তারপর আসুক ও।

ললিত বেরোল। ললিতের মনে হলো রুকসানাকে নিয়ে কেউ কেউ সমস্যা পাকাতে চাইছে। টেককেয়ার এজেন্সির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। উফ্ সকলে উপকারের হাত বাড়িয়ে আছে পরামর্শসমেত। সে এগোতেই একটি মেয়ে এসে তার পথরোধ করল প্রায়। নীলম মেয়েটিকে চিনত না ললিত। সে যেন কলোনির রাস্তার ধারে তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। বেশ লম্বা, মাথা ভরা চুল, জিন্স, চেক শার্ট, মুখে একটি সুচিত্রিত মাস্ক। উদ্ধত ভঙ্গি। নীলম বলল, আঙ্কেল আমি নীলম, আমার বাবা প্রকাশ ঝাঁ, আমাদের বাড়িতে রাম নবমীর পুজোয় আপনাকে কার্ড পাঠিয়েছিলাম।

প্রকাশ ঝাঁ কে তা জানে ললিত, তবে পরিচয় নেই। কলোনির সকলের সঙ্গে তার পরিচয় নেই, কারণ কলোনি আড়ে বহরে বেড়েছে অনেক। জানে, প্রকাশ ঝাঁ কেউকেটা কেউ হবেন। তাঁর বাড়িটি হালফ্যাশনের। বেশ ঝলমলে। ঝাঁ মশায়ের সঙ্গে তেমন কথা হয় না ললিতের। দুজনে দুই মেরুর লোক। নীলম মাস্ক খুলে ফেলল। ললিত পিছিয়ে গেল। নীলম বলল, ডরাইয়ে মাত আঙ্কেল, কুছ নেহি হোগি।

ললিত রেগে গেল, এমনিতে মাস্ক পরছে লোকে!

ইট'স আ ফ্যাশন আঙ্কেল, সিরেফ জ্বর, আমার তো হয়েছিল, পজিটিভ ভি হয়েছিল, তো ক্যা হুয়া?

বিরক্ত হলো ললিত, বলল, তুমি বেশি বুঝে গেছ, পৃথিবীতে এতো লোক মরছে এমনি এমনি?

ললিত বলল, তুমি মাস্ক পরে কথা বলো, আমি যাই।

আঙ্কেল এটা আপনাকে করতে হবেই, আজ না হোক কাল, এপিডেমিক হলেই এসব করতে হয়, এপিডেমিক চলে যায়, হিন্দু-মুসলিম দুটো আলাদা জাত আছে, ওকে বারণ করে দিন।

ললিতের আর যাওয়া হলো না। মেজাজ বিগড়ে গেল। বাড়ি ফিরে কণিকাকে বলল, রুকসানার বিরুদ্ধে লেগেছে, আমি ওকেই রাখব।

সন্ধ্যার পর রুকসানার ফোনে ডাক দিলো কণিকা। রুকসানা ফোন ধরেই বলল, বউদি, কাম না করে পয়সা নিতে শরম লাগে, হামাকে লিয়ে লাও।

মাসি এ তো দশদিন মাত্র। কণিকা বলল, ভাইরাস যদি ঢুকে থাকে দশদিন সে লড়াই করে যাবে ভেতরে, হেরে গেলে তুমি সুস্থ থাকবে।

দশদিন হামার লড়াই কেমন হবে বউদিদি, করোনা খুব বেড়ে যাবে, লকডাউন ফির হবে, তখন দশদিন দু-মাস হয়ে যাবে, লেকিন আমি তো কাম করেই পয়সা নিতে চাই। বলল রুকসানা।

তোমার সেই বাড়ির অবস্থা কী? কণিকা জিজ্ঞেস করে।

দাদার জ্বর হয়েছিল, তারপর টেস করালো, নেগেটিভ না পজিটিভ হামি জানি না।

ওরা তোমাকে বারণ করেছিল?

না, নীলমকে আমি ভুল করে বলে দিয়েছিলাম, চাদ্দিকে বহুত বুখার চলছে, হামার মেয়ের হয়েছিল গেল মাসে, ইলাজ হয়ে গেল ...।

তুমি তো বলোনি মেয়ের হয়েছিল।

ডর লাগবে তোমার বউদি, জ্বরজারি কি হয় না? করুণ গলায় রুকসানা বলল।

নীলমকে বললে কেন?

আমাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করে, সব বলতে হবে, বাবু ঘরের লেড়কি, না বললে হয়? কী বলব, ও আমার কাম নষ্ট করে দিলো দু-বাড়িতে, লক্ষ্মীদি আছে, সে বলে বেড়াচ্ছে, আমার একটা ঘরে দুই মেয়ে, একটা বাচ্চা, আমরা দুজন, পাঁচ হলো, পাঁচজন, হামি কাম খুঁজে বেড়াচ্ছি বউদি।

দশদিন বাদে তুমি এসো। কণিকা বলল।

তুমি কি নতুন লোক রাখছো, চামেলিকে, ভাইরাস হামার নেই বউদি, চামেলি ঢুকে গেলে বেরোবে না।

কণিকা বুঝল সেই বহড়ুর মেয়ে চামেলি। লক্ষ্মী বলে দিয়েছে রুকসানাকে। সে বলল, না, তুমিই থাকবে।

তাহলে কাল যাই?

না, দশদিন হোক, এসো।

দশদিন বাদে লকডাউন হয়ে যাবে, ভোট শেষ হয়ে যাবে আর সব বন্ধ হয়ে যাবে বউদি, তুমার ঘরে নতুন লোক ঢুকে যাবে, ধর্ম চলছে কাজে।

কণিকা বলল, না মাসি না, কাউকে নেব না, তুমি সব মাসে বেতন পাবে।

কাজ না করে বেতন, গুনা হবে বউদি। কান্নার শব্দ শুনল কণিকা, বিনবিন করে বলছিল রুকসানা, সব ঘরে লক্ষ্মীদি গিয়ে বলে এসেছে, নীলম তাকে পাঠাচ্ছে, রুকসানার যেন কাজ না থাকে।

কণিকা তখন হাতে ফোন চেপে ললিতকে বলল, রুকসানা খুব বিপদে পড়েছে, ওকে রাখতেই হবে, কাল থেকে আসুক।

তাই হোক, মাস্ক পরে থাকবে, ও ছুঁয়ে যাক অন্তত এ-বাড়ি।

কণিকা বলল, সারাদিন কাজ করে বেড়ায়, বিকেলে ভাত খায় বাড়ি গিয়ে, আমাদের তিনটে রুটি তো বন্ধ হবে না এলে, সকালের রুটি তিনটের জন্য এমন করছে, ক্ষিদে তো ভয়ানক, সারাদিন কাজ করে বেড়ায়।

রুকসানাকে বহাল করা হলো। ললিতকে একদিন নীলম ধরল বাজারের সময়, আঙ্কেল কথা রাখলেন না, বললেন লক্ষ্মীদিকে নেবেন, নিলেন না, গন্ধি মুসলিম লেড়কিকে নিলেন, সবাই তো ওকে ছেড়ে দিচ্ছে, ও মিথ্যে বলে কাজ করছিল আর জ্বর ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

তোমাকে এসব করার অধিকার কে দিয়েছে, সারদা কলোনির একটি কমিটি আছে, তারা বুঝবে। ললিত ক্রুদ্ধ গলায় বলল।

ললিত বোঝে, এই মেয়েটা প্রমাণ করেই ছাড়বে, রুকসানা কোভিড ক্যারি করছে, রুকসানা যেন কাম না পায়। ললিত বলল, তুমি সব জেনে বসে আছো, রুকসানা বহুদিন করছে কাজ, অনেক বাড়িতে করে, ওর কোভিড থাকলে সারদা কলোনি ছেয়ে যেত।

সারদা কলোনিতে কী হয়নি, হামার দাদি হাসপাতাল থেকে ফিরে চলে গেল, পোস্ট কোভিড ট্রাবল বলছে ডক্টর, বাট আই নো, রুকসানা, রুকসানার জন্য মরেছে।

কেন এ-কথা বলছ?

দাদি ভালো হয়ে গেছিল, রুকসানাকে দাদি ভালোবাসত, রুকসানা কোভিড দিয়েছিল দাদিকে, তারপর মেরেও দিলো।

তুমি তো অদ্ভুত মেয়ে, আজেবাজে কথা নিয়ে একজনের কাজ খেয়ে নিতে উঠেপড়ে লেগেছ?

উই আর ভিকটিমাইজড স্যার আঙ্কেল, আমাদের দাদির কোভিড হলো কী করে, রুকসানার জন্য, আমরা একটা যজ্ঞ করছি নেক্সট উইকে, আসবেন, যজ্ঞ হবে কোভিডের বিরুদ্ধে, লাঞ্চ করবেন আমাদের বাড়ি, প্রসাদ নেবেন।

ললিত বুঝল এখানে দাঁড়িয়ে থাকা অনুচিত হবে। এই সমস্ত কথা শোনাও অনুচিত হবে। যজ্ঞ! গরিবস্য গরিব রুকসানার কাজ খেয়ে নিতে কেমন যজ্ঞের পরিকল্পনা করেছে। বলছে চামেলির হাজব্যান্ড আর একটা বিয়ে করায় সে হেল্পলেস, তাকে সাহায্য করতে হবে বিকজ শি ইজ হিন্দু লেডি।

নীলম হাতে সানগ্লাস নিয়ে বলল, আঙ্কেল আমাদের সারদা কলোনিতে যেন মুসলিম কাজ না পায় দেখতে হবে, গরিব চামেলি আগে কাজ পাবে, আপনি কথাটা রাখুন, দত্ত স্যার রেখেছেন, রুকসানাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

আমি যাই।

তাহলে কথা দিলেন তো? নীলম জিজ্ঞেস করল অধীর আগ্রহে, হোম যজ্ঞে আসবেন নেক্সট থার্স ডে, বড় যোগী আসছে হিমালয় থেকে।

নো, যজ্ঞ করা নিষেধ, কোভিড ছড়াবে। ললিত বলল।

প্লিজ আঙ্কেল, কোভিডমুক্ত হতে যজ্ঞ, কথা দিন আসবেন, রুকসানাকে ছেড়ে দেবেন।

তোমাকে কথা দিতে যাব কেন, তুমি কে?

আমি কেউ না, আবার অনেক, কলোনি কমিটিতে ঢুকব এবার, তারপর এসব প্রস্তাব নেব, তখন তো আপনি রাখতে পারবেন না ঝগড়ুটে মুসলিম রুকসানা বেগমকে, একজন হিন্দুর কাজ মুসলমান নিয়ে নেবে, এ তো হতে পারে না, আর দুজন ছিল, নাজমা, লতিফা, তাদের কাজ চলে গেছে আঙ্কেল, কলোনি কোভিড ফ্রি করতেই হবে, এর জন্য যজ্ঞ করতে হবে।

ললিত আর দাঁড়ায় না। বাড়ি ফিরে কণিকাকে বলে, আমাদের সারদা কলোনি কমিটির দেখে নেওয়া উচিত কে কিনছে এখানকার প্লট, বাড়ি। বলল ক্ষুব্ধ ললিত, আমাকে শোনাচ্ছে সব ভাইরাস ক্যারি করে মুসলিমরা, কী ভয়ানক মেয়েটা, রুকসানার সব কাজ খেয়ে নিচ্ছে করোনার নাম করে।

সে তো রুকসানা বলেইছে।

খুব খারাপ, সারদা কলোনিতে এমন ফ্যামিলি তো আগে ছিল না।

বোসবাবুর ছেলে দিল্লিতে সেটলড, বোসবাবুকে নিয়ে গেল বাড়ি বেচে দিয়ে, একা তো তিনি থাকতে পারেন না।

ললিতের মেজাজ এবং মন দুই খারাপ। এই মেয়েটা যদি তার পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে থাকে, চারপাশটা খারাপ হয়ে যাবে। চায়ের কাপ নিয়ে ব্যালকনিতে বসে ছিল ললিত। ভাবছিল, যখন সারদা কলোনি প্লটিং হয়ে বিক্রি হচ্ছিল, সেই সময় মুসলিম একজন জমি কিনেছিলেন। সরকারি অফিসার। নামটা মনে আছে। মহম্মদ আলি। তিনি দু-বছর বাদে নতুন বাড়ি বেচে দিয়ে চলে গেলেন। কেন

গেলেন? না, ফ্যামিলি থাকতে চায় না। আজান শোনা যায় না এখানে। আলি সায়েবের বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন ধর্মপ্রাণ। আলি সায়েব থাকলে নীলমের সুবিধে হতো কি পরিকল্পনা করতে? তখন ফোন এলো সুলগ্না টেককেয়ার এজেন্সির। হ্যালো স্যার। সেই মেয়েটির গলা।

নয়

ললিত বলল, আমি ব্যস্ত রয়েছি।

ব্যস্ত আপনি নেই স্যার, আপনার মনে একটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, সেই কারণে আপনি ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন, আমরা সব জানি।

ও আপনারা তো স্পাইং এজেন্সি, সবই জানেন।

এখন মার্কিন চিন রাশিয়া বলে কিছু নেই স্যার, উই আর লিভিং ইন আ গ্লোবাল ভিলেজ, পৃথিবী একটি ভুবন গ্রাম, এখানে সব চলে এখন, স্যার আপনি আমাদের বলুন কী অসুবিধে হচ্ছে।

আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না, ঠিক আছি।

তা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, এখন এই কোভিড পিরিয়ডে কেউ ভালো নেই, আমরা আপনার সব সমস্যা মিটিয়ে দিতে পারি, আপনাকে তো অফার দেওয়া হয়েছে, নদীর ধারে জানালা, ব্যালকনি, আপনারা থাকবেন, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

নিজের বাড়িতে আছি, অন্য জায়গায় যাব কেন?

আপনি ওখানে ভালো নেই স্যার, হিন্দু-মুসলিম, কে খুন হচ্ছে আবার হচ্ছে না, আপনার অনলি সান কবে আসবে ঠিক নেই, একা দুজনে থাকেন, বিপদ ঘটলে কেউ দেখার নেই, আপনার কুক দেশে ফিরে যাবে কোভিড কেটে গেলে, তখন কী হবে?

ভয় দেখাচ্ছেন? ললিত ক্রুদ্ধ হলো।

নো স্যার, আপনাদের মতো মানুষের ভবিষ্যতের কথা বলছি, দ্যাট নীলম, শি ইজ আ নটরিয়াস গার্ল, ও আপনাকে বিপদে ফেলতে চাইবে, কুক চলে গেলে আর পাবেন না।

ললিত বলল, যা হবার তা হবে।

কী হবে স্যার, অতবড় বাড়িতে দুজনে থাকবেন, ঘর পরিষ্কার করার সার্ভেন্ট পাবেন না, রান্নার লোক পাবেন না, বাড়িতে ধুলো জমে যাবে, ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাবে ক্রমশ, কল্পনা করতেও পারবেন না কী হতে পারে, এক-একদিন না খেয়ে শুয়ে থাকতে হবে, দিস ইজ আওয়ার, আই মিন ইয়োর ফিউচার।

উফ্, আপনি থামবেন। ললিত গর্জন করে উঠল।

আমি স্যার আপনার ভালো চাই, দিস এজেন্সি ওয়ান্ট টু সার্ভ ইউ, পরিষেবা দিতে চাই।

তখন ললিত বলল, পরিষেবা দেবেন, তাহলে একটা কাজ করতে পারবেন, আমার ছেলের বয়স আটত্রিশ, আটত্রিশ বছর আগে একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে আমাদের বাঁচিয়েছিল, সে ভগবানের মতো দেখা দিয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল, টেককেয়ার এজেন্সি, তাকে আমি খুঁজছি, দেখি কেমন পরিষেবা দিতে পারেন।

সুলগ্না বলল, আচ্ছা স্যার দেখছি, আশা করি পারব, আমরা কখনো ফেইল করি না, বলছি আপনি সাবধান থাকবেন, মাস্ক ব্যবহার করবেন, মহামারি চলছে, আবার ঢেউ আসতে পারে।

ফোন এখানেই শেষ হয়েছিল। এরপরে যা ঘটেছিল তা বিবৃত করা হচ্ছে। ললিত ভেবেছিল সে গায়েপড়া ওই এজেন্সির অভিসন্ধি ভেঙে দিতে পেরেছে। অভিসন্ধি হলো তাকে একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে এই বাড়ি দখল করে নেওয়া। এমনি ঘটছে কত। কদিন ধরে টেলিভিশনে জোড়া খুন নিয়ে খুব রিপোর্ট দেখতে পাচ্ছিল। বাড়ি দখল করার প্রমোটার ধরা পড়েছে। ললিত আবার দুপুরে বের হতে লাগল। এপার থেকে ফেরি লঞ্চে ওপারে যেতে লাগল। হাওড়া, হাওড়া থেকে আবার পার হয়ে বাবু ঘাট, ফেয়ারলি প্লেস। ফেরি লঞ্চ আবার ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। তবে আগের মতো নয়। ট্রেন বন্ধ রয়েছে। লোক হাওড়ায় আসছে। স্পেশাল ট্রেনে আর কতজন আসতে পারে? ললিত এই বসন্ত সমাগত প্রায় দুপুরে হাওড়া থেকে পার হয়ে আসছিল আহিরিটোলা। ফেরি লঞ্চে উঠে নিত্যকার অভ্যাসমতো সে নানা মানুষের মুখে একটি মানুষের মুখ খুঁজছিল। তাকে সে দেখেছে আটত্রিশ বছর আগে মিনিট দশেকের মতো সামনে থেকে, বাকিটা পেছন থেকে। দেখেছিল ঝড়জলের রাতে। ললিতের মনে হচ্ছে, সে এলে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যেত তাদের জীবনে। অথচ এই মহামারির দিনে কী স্বাভাবিক, কী অস্বাভাবিক ধরা যায় না। কার ভেতরে কী আছে ধরা যায় না।

ললিতের চেনা মনে হয় একটি মানুষকে। মনে হয় চেনা অথচ চেনা নয়। মনে হয়, চিনি উহারে। মনে হয় এই লোকটি হয়তো সে। ইদানীং তার মনে হচ্ছে, সেই লোকটিকে চিনে না নিলে এই মহামারির দিনে এই বিস্তীর্ণ জনপদে বাস করা কঠিন  হয়ে দাঁড়াবে। শহর তো লোকে লোকারণ্য। তার ভেতরে

ঠগ্‌-জোচ্চোর, কাজ-হারানো মানুষ, অভুক্ত মানুষ, সদ্য ভ্যাকসিন, না-ভ্যাকসিন, ভাইরাস নিয়ে ঘোরা মানুষ ভর্তি। কেউ কারো মুখ দেখতে ভয় পায়। মহামারি চলছে। পারাপার করতে করতে আজ হয়তো তাকে দেখতে পেয়েছে। এজেন্সির কথা খেটে যাচ্ছে। জনারণ্য থেকে সে একটি লোককে আলাদা করে নিয়েছে। এই লোকটিই সে।

গঙ্গা পার হয়ে আহিরিটোলা ঘাটে নামল দুজনে। একজন আগে আগে দ্রুত পায়ে এগোল, অন্যজন তাকে অনুসরণ করতে লাগল। ঘাট থেকে কিছুদূরে অটোস্ট্যান্ড। ফেরি লঞ্চের যাত্রীরা অনেকেই লাইন দেয়। কোনো অটো যাবে শোভাবাজার মেট্রো। কোনোটা যাবে বিধাননগর স্টেশন মানে উল্টোডাঙা। সেখান থেকে কতদিকে যে কত মানুষ চলে যায়। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস, পরপর হাসপাতাল, সল্ট লেক সেক্টর ফাইভ, আইটির যুবক-যুবতীরা, আবার যায় এয়ারপোর্ট হয়ে মধ্যমগ্রাম, বারাসত ...। ট্রেনেও যায়। একজন ললিত এবং আর একজন, ফেরি পার হয়ে আসা এক যাত্রী, যে কি না বর্ধমান মেইন এবং কর্ড লাইন ধরে যে-কোনো জায়গা থেকে আসতে পারে, অথবা সাউথ ইস্টার্ন রেলের খড়গপুর শাখা যে-কোনো স্টেশন থেকে আসতে পারে, সেই স্টেশনে আবার আসতে পারে যে-কোনো গঞ্জ থেকে, মানুষের আসা কিংবা যাওয়া যেভাবে ঘটে থাকে, তাই-ই হয়েছিল, সে এসে নামল বিধাননগর রোড

মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ আসছে ধীরে ধীরে। কিন্তু প্রথম  মহামারির ঢেউ চলে গেছে বলা যায় না। কমেছে জ্বর সাময়িক কমার মতো করে, কিন্তু রেমিশন হয়নি। একেবারে যায়নি। আক্রান্তও আছে, মৃত্যুও আছে। যখন সংক্রমণ লাখের ওপর দু-লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছিল, পটাপট মানুষ মরছিল দম বন্ধ হয়ে, তখন ললিতের চার চেনা মানুষ, পাঁচ প্রায় চেনা মানুষ, অসংখ্য অচেনা মানুষ চলে গেছে বাড়ি খালি করে। সেই সময়ও ললিত বেরোত; কিন্তু লকডাউন চলছিল বলে ফেরি বন্ধ ছিল। লকডাউনের ধাক্কায় হাওড়া ব্রিজ দিয়েও পারাপার চলছিল না। এক জায়গার মানুষ যেন অন্য জায়গায় না যায়। গমনাগমন রোধ হলে মহামারির প্রকোপ কমবে।

নদী পার হওয়া ললিতের একটি অভ্যাস। সে হাওড়ায় যায় আর কলকাতায় ফেরে। কলকাতায় আসে আর হাওড়ায় ফেরে। এর বেশি কিছু নয়। এখন ললিত বিধাননগর রোড স্টেশনে। বেলা দুপুর। লোকজন কম। বাসও কম। তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকল। লোকটার পরনে রংজ্বলা ক্রিম রঙের প্যান্ট, হালকা নীল হাওয়াই শার্ট, পায়ে ক্যানভাসের মোকাসিনো। মাথাভর্তি কালো চুল। মনে হয় কলপ মারা কিংবা কালো চুল বসানো। বয়স তার থেকে পেছনে, পঞ্চাশ-বাহান্ন। এই বয়সে মাথাভর্তি এতো কালো চুল থাকে না। ললিতের মনে পড়ল, বিশুদ্ধ কোরিয়ান পদ্ধতিতে রোপণ করা মাথাভর্তি কালো চুল। বরুণ দত্ত। কিন্তু এই মুখ সেই মুখ নয়। এই মুখ আরো চেনা। চেনা মুখ যেমন হয়, চোখেমুখে ধূর্ত হতে পারে, নাও পারে, একেবারে নিরীহ মুখও হতে পারে, নাও পারে। ফন্দিবাজ হতে পারে। নাও পারে। দশ মিনিটের দেখা। আরো কম হতে পারে। বাকিটা পেছন থেকে। ঝড়জলের রাত। গাড়ি চলেছে হাসপাতালের দিকে। চোখে চশমা রয়েছে বলে ললিত ঠিক ধরতে পারছে না। লোকটার গালে কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রোজ শেভ করে না বলেই মনে হয়। বাধ্যবাধকতা নেই। নেই মানে চাকরি নেই। চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছে হয়তো। তাও নয়। অনেকেই নিয়মিত শেভ করে না। যেমন ললিত। আবার করেও ইচ্ছে হলে পরপর কয়েকদিন। ললিত ভাবল, গিয়ে বলে, ভালো আছেন?

তখন লোকটা বলবে, হ্যাঁ, আপনি?

ভালো আছি। জবাব দেওয়ার পর কথা কীভাবে এগোবে? সে কি জিজ্ঞেস করবে, আপনি কোথায় যাবেন?

লোকটা বলল, সে আসুক।

সে কে? তা জানতে চাওয়া ললিতের এক্তিয়ারের বাইরে। কিন্তু লোকটা যদি বলে বারাসত। ললিত কি বলবে সেও বারাসত যাবে। বারাসত না বলে নিউটাউন বললে, ললিতও কি নিউটাউন ছুটবে? একসঙ্গে যাওয়া যাবে। তখন লোকটা যদি জিজ্ঞেস করে, সে কোথায় যাবে, চুপ করে যাবে ললিত। সে তো লোকটার সঙ্গে যাবে। চেনা সেই মুখ নজরে পড়েছে। চেনা মুখ ছাড়বে না ললিত। এই মহামারিতে আরো চেনা মুখ অনেক চলে গেছে। জিতেন্দ্রচন্দ্র মহত্তম রায় গেল কদিন আগে। অভীক এক বিরল জাতের ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আর ফেরেনি। পবিত্রদা তাই। অজিত তাই। খুব কমবয়সী সৌরভ তাই। জীবন পাল হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেও আবার হাসপাতালে গেল, আর ফিরল না। অনীশ রায় এক মাসের ওপর হাসপাতালে থেকে ফেরেনি। না, চার-পাঁচজন নয়, অনেক চেনা মানুষ চলে গেছে। এই লোকটা রয়ে গেছে। কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে ললিত লক্ষ রাখছে লোকটাকে। মুখ থেকে মাস্ক নামিয়েছিল যখন তখনই ললিত তার মুখ দেখেছে। সেই মুখ ঢেকে নিলেও সেই মুখ সেই মুখই। ঝড়জলের রাতের সেই মুখ।

লোকটা মোবাইল ফোনে কথা বলছে। কথা শুনতে পাচ্ছে না ললিত। ফোন নামিয়ে এদিক-সেদিক দেখতে লাগল। তারপর দেখে ফেলল। যেন হলুদ আলোয় ভরে উঠল চারদিক। কোথা থেকে এলো এই আলো। এসেছে এসেছে। সে এসেছে। হলুদ রঙের কামিজ আর ফেডেড নীল জিন্স। মাথায় খোলা চুল কাঁধ অবধি এবং হলুদ হেয়ার ব্যান্ড। পায়ে সাদা জুতো। স্বাস্থ্যবতী। লাবণ্যময়ী। কত বয়স হবে? বছর পঁচিশ। লোকটা এর জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে এতো সময়। লোকটা এর জন্য একটা নদী পেরিয়ে এসেছে। তার আগে ট্রেন। চন্দননগর কিংবা ব্যান্ডেল থেকে এসেছে হয়তো। বাগনান কিংবা উলুবেড়িয়া বা কোলাঘাট থেকেও আসতে পারে। আবার তা না হয়ে হাওড়ার ডোমজুড়, আমতা থেকেও আসতে পারে। আসার অনেক অনেক জায়গা আছে। ললিত আকাশে তাকালো। ফাল্গুন মাস শেষ হয়ে এলো। আকাশ আলোয় আলোয় ভরা। সেই আলোয় হলুদ ছায়া পড়েছে স্পষ্ট। মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, তুমি কি অনেক সময় এসেছো স্বজন? (আমরা সকল ক্লায়েন্টকে আপন মনে করি। পারিবারিক। স্বজন। সুজন।)

স্বজন! এতো সময়ে চেনা গেল। স্বজন ডাকটি কত সুন্দর। সেই কতদিন আগে, বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ আগে সে স্বজন নামে একটি নাটক দেখেছিল। কয়েকটি শো হয়, তারপর বন্ধ হয়ে যায় দল ভেঙে গেলে। ললিতের সত্তর হয়নি বটে, কিন্তু সত্তরের দিকে সে যাত্রা করেছে, কদিন বাদেই পৌঁছে যাবে। সেই স্বজন? ললিত মনে করতে চাইল নাটকটা। মনে করতে পারল না। নামটা মনে আছে। সেই নাম। সেই স্বজন, নাকি অন্য স্বজন। স্বজনের দেখা সে পেয়েছিল সেই রাতে। সে। হ্যাঁ, তুমিই সে। এ কোন লোকটা, সেই লোক, সেই যে মধ্যরাতে কণিকাকে হাসপাতালে নিয়েই যেতে হবে। সেদিন সন্ধ্যা থেকে আকাশ ভেঙে পড়েছিল। ললিতের স্ত্রী কণিকার ব্যথা

উঠেছিল। হাসপাতাল না নিয়ে গেলে বিপদে পড়ে যাবে সে। সারারাত ঘরে রাখা যাবে না। অথচ খবর আসছিল ভেসে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণ। ললিত তার মধ্যে বেরিয়েছিল ছাতা মাথায়। রাত তখন এগারোটা। কী বৃষ্টি! কয়েক মিটার দূরের পথ দেখা যাচ্ছে না। তখন কোথায় কী? শুধু একটা ট্যাক্সি অন্ধকার থেকে আবির্ভূত হলো আচমকা। তার পাশে দাঁড়াল, কী খুঁজছেন? ললিত বলেছিল, আপনাকে। হাসপাতাল যেতে হবে।

লোকটা বলল, কতদিন বাদে তোমাকে দেখলাম সুলগ্না।

ললিত চমকে উঠল। সুলগ্না। সুলগ্না এসে দাঁড়িয়েছে কয়েক হাত দূরে। সুলগ্নাই না বলেছিল খুঁজে এনে দেবে সেই লোকটাকে। ললিত শুনল সুলগ্নার কণ্ঠস্বর। স্বজন আমিও বা কতদিন বাদে দেখলাম তোমাকে, শম্ভুর চেয়ে স্বজন নামটি আমার প্রিয়, বুঝলে শিবশম্ভু। মি. এস এস, আমার স্বজন।

ভেতরে ঢুকে স্ট্রেচার নিয়ে এসেছিল নিজেই। তারপর ডাক্তার-নার্স, বেড, ও টি। ললিত যখন নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে এলো, লোকটা নেই। গাড়ি নিয়ে চলে গেছে। সারারাত জেগে বসেছিল সে। ভেবেছিল গাড়িটা ফিরবে। ধারেকাছেই আছে। ভোররাতে ললিত পুত্রসন্তানের পিতা হয়েছিল। এই লোকটা সেই লোকটা মনে হয়। আবার না হতেও পারে। তাকে তো বর্ষার রাতে ভালো করে দেখতেই পায়নি। যেন ভগবান দেখার মতো করে দেখা। দেখা দিয়েই অদৃশ্য। মিল হতে পারে, না হতেও পারে। লোকটাকে সে খোঁজে, হলুদ ট্যাক্সি দেখলেই চালকের মুখে আলো ফেলে, সে নয় তো? আর ইদানীং কণিকা লোকটার কথা বলে খুব। অভিষেকের জন্মের সময় সেই ছিল পরিত্রাতা।

সুলগ্না বলছে, তখন খুব খুব উদ্বেগে ছিলাম স্বজন, তুমি ভালো আছো কি নেই বুঝতে পারছিলাম না, চলো ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে কথা বলি, ছায়া আছে।

ললিত অনুসরণ করল। মেয়েটা কলকল করছে, লোকটা ঘাড় নাড়ছে। মেয়েটা মধ্যম উচ্চতার, একটু ভারি, কিন্তু খুব স্মার্ট। টগবগ টগবগ করছে যেন। হাসছে খুব। আনন্দ হয়েছে খুব। সুজন বন্ধু, স্বজন, তুমি যে সত্যিই আসবে ভাবিইনি। ট্রেনে তো খুব ভিড়। খুব কষ্ট হয়েছে তো।

লোকটা মাথা নাড়ল। সুলগ্না কাঁধের ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে। খেয়ে নাও একটু। ওরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ললিত অনুসরণ করতে থাকে। মেয়েটার ঘাড়ের কাছে চুলের সার দোল খাচ্ছে। জলের বোতল ব্যাগে ভরে সে হাত ধরল। লোকটার গরিমায় লাগল, বলল, হাত ধরতে হবে না, আমি পারব।

আমার যে হাত ধরতে ইচ্ছে করে সুজন।

অপ্রয়োজনে হাত না ধরলেও হবে।

ওপরে উঠে কথায় কথায় ললিত শুনল লোকটা অজ্ঞান হয়ে ছিল দুদিনের মতো। মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছে। কই মাছের প্রাণ। না, করোনা নয়, কটি মাস্তান তাকে পিটিয়ে লাশ করে দিয়েছিল প্রায়। বিনিময়ে একটা মেয়ে বেঁচে গিয়েছিল। সে গত নভেম্বরের কথা। তার নিজের মোবাইল গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। ঘটনা টেলিভিশনে দেখিয়েছিল। খবরের কাগজে উঠেছিল। ললিতের মনে পড়ল। টেলিভিশনে এই নিয়ে বড় নিউজ হয়েছিল। কিন্তু কোভিড নিয়ে আতঙ্কিত মানুষ এসবে বিশেষ আলোড়িত হয়নি। সে এইজন। সুলগ্নার সুজন। সুলগ্না  বলল, ফেরার পথে আমাদের বাড়ি যাবে না স্বজন?

লোকটা বলল, তোর বাবা ভালো আছেন?

আছে, তবে কোম্পানি তো বন্ধ ছিল, মাইনে অর্ধেক করে দিয়েছিল, এখন আবার খুলেছে, বাবাকে ছাঁটাই করেনি।

ভালোমানুষ। বলল লোকটা।

কে ভালোমানুষ?

তোর বাবা। লোকটা বলল।

সুলগ্না মাথা নাড়িয়ে বলল, কোম্পানির মালিক ভালোমানুষ, তাই বাবা বেঁচে গেল, আর মেজো কাকা! তার তো চাকরি নেই, কাকির টিচারি আছে, তাই বেঁচে গেল।

তুই সাবধানে থাকিস তো? লোকটা বলল, সেকেন্ড ওয়েভ আসছে, করোনা কতভাবে ক্ষতি করে দিয়ে গেছে মানুষের।

সে বলল, আমার যে গানের ইস্কুল ছিল উঠে গেছে স্বজন বন্ধু, কেউ বাচ্চাদের পাঠায় না।

এস এস বলল, আবার হবে।

হলে ভালো, সেবার তুমি বলেছিলে আমার চাকরি হবে, তখন হয়নি চাকরি কিন্তু পনেরো দিনের মধ্যে হলো, তোমার কথা একদম খেটে গিয়েছিল।

মনে হয়েছিল তাই বলেছিলাম, এমনি কত বলেছি, খাটেনি, বেশিরভাগ। এস এস মাথা নাড়ল।

মনে হয়েছিল তাই বলেছিলাম, এমনি কত বলেছি, খাটেনি বেশিরভাগ। এস এস মাথা নাড়ল।

তা জানি না ভালোমানুষ, আমাকে যখন ফোন করে কোম্পানি থেকে বলল, আমি অবাক, তুমি কি কোম্পানির কেউ, কদিন আগে বললে চাকরি হবে, আমি চার মাস আগে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, তুমি কী করে বলেছিলে চাকরি হবে, জানলে কীভাবে?

কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে এস এস বলল, এখানে আসতে বললি কেন?

আমার যাওয়া ছিল সল্ট লেকে, একজন খুব অসুস্থ, দেখতে গেলাম, আমার মায়ের মাসি, মাসিদিদা, তাই এখানে আসতে বললাম, তোমার কি কষ্ট হলো খুব?

না, কষ্ট কেন হবে, ট্রেন, লঞ্চ, অটো, ট্রেনে খুব ভিড়, তবে দুপুরে একটু খালি, যাওয়ার সময় বাসে যাব।

সুলগ্না আচমকা বলল, তুমি আমার জন্য কী এনেছো?

লোকটার মুখ ম্লান হয়ে যাওয়ার কথা। ললিত স্পষ্ট দেখতে পায় সত্যিই ম্লান। মেয়েটা ওকে দুঃখী করে দিলো। সে তো কিছুই আনেনি। লকডাউনে তার ট্যাক্সি বসে গেছে। সে মগরা কিংবা হুগলিঘাট চলে গেছে কলকাতা ছেড়ে। মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠল, এই তো তোমার মন খারাপ, তুমি তোমাকে নিয়ে এসেছো স্বজন, তুমি এসেছো বলেই তো তোমাকে আবার দেখতে পেলাম।

তুই আমার জন্য কী এনেছিস?

কী আবার আনব, আমিই তো এসেছি স্বজন বন্ধু, কতদিন বাদে দেখা হলো বলো, বাবা প্রায়ই বলেন লোকটাকে কতদিন দেখিনি, গড।

কে গড? লোকটা জিজ্ঞেস করে।

তুমি স্বজন, বাবার কোম্পানির ক্যাশ টাকা ছিল, তুমি ব্যাগটা পেয়ে নিয়ে এলে আমাদের বাড়ি।

ব্যাগের ভেতরে তোর বাবার আই কার্ড না থাকলে হতো না।

মেয়েটি বলল, না থাকলে তুমি কী করতে গো?

লোকটি বলল, লালবাজারে জমা দিতাম।

ইস্, তাহলে পেতই না বাবা, না পেলে বাবার চাকরি থাকত না, দেড় লাখের মতো ছিল।

নিজেকে টাকাটা দিতে হতো। লোকটা বলল।

মেয়েটি বলল, সে তো দিতে হতো, তারপরে চাকরিও যেত, মালিক ভালোমানুষ; কিন্তু দায়িত্বে অবহেলা সহ্য করতে পারে না, এর আগে দুজনের চাকরি গেছে এইভাবে।

লোকটা বলল, উনি কী করে ফেলে গেলেন অটোয়?

বাবা অদ্ভুত, সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল বসন্ত এসে গেছে, শীতকাল ছিল, এই যেমন আজ, বসন্ত এসে গেছে, কৃষ্ণচূড়ার বন্যায় চৈতালি ভেসে গেছে।

সত্যিই বসন্ত বসন্ত মনে হচ্ছে, গানটা কী যেন? লোকটা জিজ্ঞেস করে।

সেই কবেকার একটা গান, মনে করো আমি নেই, বসন্ত এসে গেছে ...।

হ্যাঁ, সুমন কল্যাণপুর, অপূর্ব গান! গুনগুন করল লোকটা।

মেয়ে বলল, সেই গান সকাল থেকে পেয়ে বসেছিল বাবাকে, সেই গান মাথায় এমন চরকি দিচ্ছিল, বাবা ভুলেই গেল ব্যাগের কথা, অটো থেকে গুনগুনন করতে করতে নেমে পড়ল, আর সেই অটোয় তুমি ছিলে, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে গো?

বাড়ি যাচ্ছিলাম, ফেরিতে গঙ্গা পার হয়ে হাওড়া, হাওড়া থেকে ট্রেন।

মোটেই না। মেয়ে হেসে বলল, তুমি আমাদের বাড়ি আসছিলে, বাবার মন খারাপ, মায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, অতোটা টাকা, চাকরি।

লোকটা বলল, তোদের বাড়ি খুঁজতে কম ঘুরতে হয়নি, এ-গলি, সে-গলি, নর্থ ক্যালকাটার বাড়ি সব গায়ে গায়ে লাগানো।

বাহ্, আমাদের বাড়ি কি সহজে পাওয়া যায় স্বজন, খুঁজতে হবেই, তোমাকে আমরা পেলাম, ভালোমানুষ স্বজনের মতো স্বজন পাওয়া কি সহজ কথা। মেয়ে হেসে বলল, কী ভালো লাগছে, তুমি এসেছো, আমি ডাকলাম তুমি এলে সেই ট্রেন, ফেরি, অটো করে, তুমি সত্যিই স্বজন আমাদের।

লোকটা বলল, দুর্জনও বলতে পারিস।

কী যে বলো তুমি, দুর্জন হতে যাবে কোন দুঃখে।

ললিত সেই ফ্লাইওভারে দাঁড়িয়ে সামনে অনেকদূর দেখতে পাচ্ছিল, কাঁকুড়গাছির মোড় পর্যন্ত প্রায়। তারপর ফুলবাগান মোড়, তা ছাড়িয়ে বেলেঘাটা ...। অনেকদিন ওদিকে যাওয়া হয়নি। মহামারির আগে গিয়েছিল এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে। তার খোঁজ নেই অনেকদিন। ফোন করে দেখেছে, বেজে যায়। ললিত নিচে চোখ দিলো, পিঁপড়ের মতো মানুষ, তবে সংখ্যা বেশি নয়। গাড়ি কম নেই। ছুটছে, দাঁড়াচ্ছে, ছুটছে।

স্বজন বন্ধু শুনছো?

শুনছি তো।

সে আবার কী কথা? সুলগ্না অবাক।

অনেকেই বলে, তোমায় কেন লাগছে এতো চেনা।

হা-হা করে হাসল সুলগ্না, চাপা গলায় বলল, তুমি খুব রোমান্টিক।

একদম না, আমি নাকি ফ্যান্টাস্টিক, তোর বাবা বলেছিল।

না গো, তুমি রোমান্টিক, তোমার মুখ চেনা মানুষের মুখ, এতো আপন মনে হয়, যেন আজন্মকালের বন্ধু, আমিই তো দরজা খুলেছিলাম, বাবা গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন, অতো টাকা, চাকরি, বড় চাকরি তো নয়, পরের দিন পেমেন্ট হবে সাইটে, কন্সট্রাকশন কোম্পানি তো, বাবা টাকা তুলে ট্যাক্সি করে বাড়ি ফেরে, কিন্তু সেদিন অটোয় উঠেছিল ট্যাক্সি না পেয়ে।

ললিত বুঝে নিল এইটা হওয়ার কথা ছিল, যেমন মানুষের জন্মের সময় সে হাজির হয়ে গিয়েছিল প্রবল বর্ষণের রাতে। না এলে কণিকা তার সন্তান নিয়ে বাঁচত কি না জানে না। অবস্থা জটিল হয়ে গিয়েছিল। এখন সে বিদেশে। ললিত ভাবে,

পৃথিবীটাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে ভগবান, তা তিনিই জানেন। তার এখন সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু সিগারেট আছে, দেশলাই নেই। ফেলে এসেছে বাড়িতে।

তোর বাবা কি কবি? লোকটা জিজ্ঞেস করল।

না, তবে গানপাগল। মেয়ে বলল।

কিছুই জানিসনে, খোঁজ নিয়ে দ্যাখ, কবি।

বাবাকে তো কোনোদিন কবিতা নিয়ে কথা বলতে শুনিনি।

মনের ভেতরে কবিতা ভেসে বেড়ায় রে, তুই বুঝতে পারিস না। লোকটা হাসল। বলল, একটা সিগারেট ধরাই, অনেক সময় খাইনি।

তুমি এটা ত্যাগ করেছিলে না? সুলগ্না জিজ্ঞেস করল চোখ পাকিয়ে।

লোকটা হেসে বলল, কতবার ছেড়েছি, কতবার ধরেছি।

একটাই তো? সুলগ্না জিজ্ঞেস করল।

লোকটা বলল, একটা নিই, অনেকদিন ধোঁয়া নিইনি।

বাবাকে বন্ধ করিয়েছি, একদম না।

লোকটা সিগারেট ধরাল লাইটার থেকে। বুকভরে ধোঁয়া নিয়ে বাতাসে ভাসিয়ে দিলো। তারপর বলল, আমিও অবাক হয়েছিলাম তুই দরজা খুলেছিস দেখে।

কেন, অবাক হয়েছিলে কেন? মেয়ে মাথা উঁচু করে লোকটার চোখে চোখ রাখল। লোকটা বলল, একেবারে চেনা মুখ, কত দেখেছি কত জায়গায়।

তাই, বলোনি তো কোনোদিন। গ্রীবা বাঁকিয়ে কবুতরের মতো তাকিয়ে থাকল সেই মেয়ে।

বলব কী, আলাপ হয়ে গেল, আমি জিজ্ঞেস করলাম আশিস রায় আছেন।

আমি দেখলাম তোমার হাতে ব্যাগ, চিৎকার করে উঠলাম, বাবা বাবা, তোমার ব্যাগ। মেয়ে হাসতে হাসতে বলল, হাসিতে ওর গালে টোল পড়ল।

ললিত ভালো করে দেখতে চাইছিল লোকটার মুখ। কিন্তু পারছিল না। আবছা, ঘুমের ভেতরে এসে মিলিয়ে যাওয়া মুখ যেমন হয়,

তেমনি মনে হচ্ছিল। লোকটা সেই পুরনো সারদা কলোনির ওখানে সেই ঝড়জলের রাতে গিয়েছিল কীভাবে? অত বর্ষার  ভেতরে অত রাত্রিতে তাদের এলাকায় এলো কোন পথে? সেদিন বাস-ট্রাম সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। টের পেয়েছিল লোকটা যে দরকার পড়বে তাকে। মানুষের জন্ম হবে। আশিস রায়ের সেদিন বসন্তে পেয়েছিল। মনে করো আমি নেই, বসন্ত এসে গেছে ...। শীত রয়েছে ভালো, কিন্তু বসন্ত ঢুকতে চাইছে গুঁতিয়ে। এর জন্য ঠিক লোকটার মনে গিয়ে হানা দিতে হবে। বসন্তই ভগবান। তার সঙ্গে দেখা করাতেই এই আয়োজন। ব্যাগ হারাবে জেনে তিনি তার পাশে গিয়ে বসলেন অটোয়। বাকিটা তো ইতিহাস।

ইতিহাস! খিলখিল করে হাসল সুলগ্না, সো কিউট, তুমি হলে গুডম্যান, আজ তুমি কলকাতায় থেকে যাও, আমাদের বাড়ি, অনেক রাত অবধি আমরা সবাই গল্প করব।

তাই হয় নাকি, মহামারি চলছে, আমি গেলাম, তোদের বাড়িসুদ্ধ করোনা জ্বর হয়ে গেল, আমিই তো দায়ী হবো, বিচার হবে। লোকটা সিগারেট নিচে ফেলে জুতোয় মাড়িয়ে দিতে দিতে বলল।

কোন আদালত? মেয়ে জেরা করতে লাগল।

হাইকোর্ট, মামলা দায়ের করবে পুরসভা। এস এস বলল।

হি-হি করে হেসে ফেলল সুলগ্না, বলল, তুমি এমন এমন কথা বলো বন্ধু, মামলার হিয়ারিং হতে পাঁচ বছর লাগবে। কিচ্ছু হবে না, তোমার কোনো অসুখ নেই।

এগারো

কথা হয়ে যাচ্ছিল। কথা শুনতে পাচ্ছিল ললিত। এস এস বলছিল, কারোরই কোনো অসুখ নেই, কিন্তু হয়ে যেতে সময় লাগবে না, মহামারি যাবে না তাড়াতাড়ি, মহামারি আইন খুব কঠোর।

মহামারি চলে গেলে মহামারির কথা সকলে ভুলে থাকবে আরেকটা মহামারি না আসা পর্যন্ত। মেয়েটি বলল।

না, পুলিশ ফাইল যে-কোনো দিন খুলে দেখা হতে পারে, নতুন করে অভিযোগ দায়ের করা হবে, জানি একটা জামিনে আসামি মুক্তি পেলে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা মামলায় গ্রেফতার করে আইনরক্ষকরা।

ললিত ভাবছিল, সে যদি লোকটাকে নিয়ে যেতে পারে তার বাড়ি, মশায় শুনছেন, আপনিই তো সে?

হ্যাঁ, আমিই সে, কিন্তু কে সে, কার কথা বলছেন, কোন ঘটনার কথা?

সেই যে ঝড়জলের রাত। ললিত বলল।

হ্যাঁ, ঝড়জলের রাত।

মনে পড়েছে?

পড়েছে মনে, আমার কী অপরাধ, আমি তো প্রত্যাখ্যান করিনি।

না করেননি, করতে পারতেন, তার আগে তিনটি প্রত্যাখ্যান হয়েছিল, আজ মদীয় গৃহে দুটি অন্ন যদি গ্রহণ করতেন মশায়, আমি ঋণ শোধ করতাম।

আপনি কে, আপনাকে আমি ভুলে গেছি।

এক মানুষের জন্ম হবে জানতেন আপনি? ললিত চাপা গলায় বলল।

মোটেই না, হয়ে গিয়েছিল, আপনিই কি সে, খুব বর্ষা ছিল সেদিন, সেদিন আমি তিনটি ঘটনার মুখোমুখি হই, একজনকে নিয়ে গিয়েছিলাম পিজি হাসপাতালে, হৃদরোগে ঢলে পড়েছিলেন, খোঁজ পেয়েছি এখনো তিনি বেঁচে আছেন, একজনকে নিয়ে যাই শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, ট্রাম রাস্তায় পড়েছিলেন, তিনি কবি।

সে কবে? ললিত জিজ্ঞেস করল, এ তো তার জন্মের সময়ের কথা বলছে প্রায়, ১২ই অক্টোবর ১৯৫৪, তার জন্ম নভেম্বরে, ওই সালেই।

কবে তা স্মরণে নেই, জীবনের সব সন-তারিখ কি মনে রাখা যায়? এস এস বলল।

ললিত বলল, মানুষ এতো কষ্ট পায় কেন?

জানি না, মানুষের ভুলেই মানুষ কষ্ট পায় মনে হয়।

সবই কি ভুলে?

এস এস বলল, না সব ভুলে নয়, মানুষ আনন্দ পায় মানুষকে কষ্ট দিয়ে।

আমি আপনার সব কথা শুনতে চাই, সারারাত শুনব।

কোভিড আইনে আমি যেতে পারি না আপনার বাড়ি। এস এস বলল।

তখন সেই মেয়ের মোবাইলে ডাক এসেছিল। সে সরে গিয়ে কথা বলে যাচ্ছে মাথা নেড়ে নেড়ে। ললিত একটু সুযোগ পেল। কথা বলে নিল। এস এস। না এস ও এস। সেভ আওয়ার সোল। মহামারির দিনে লোকটা ফিরে এলো সুলগ্না টেককেয়ার এজেন্সির মাধ্যমে। কথা আরো বলতে যাচ্ছিল ললিত। তার কথা কম নেই। রুকসানার কথাও তার কথা। কণিকার কথাও তার কথা। তার কতজন মরে গেল। সেইসব কথাও কম নয়। এস এস। লোকটা। শুনছো, অনেক কষ্টে গড়া বাড়ি থেকে চলে যেতে বলছে এজেন্সি। তোমার ওই সুলগ্নার এজেন্সি হতে পারে। ললিতের বলা হলো না। সুলগ্না ফিরে এলো। মেয়ে ফিরে আসতে লোকটা কথার জবাব দিতে লাগল।

– আপনিই সে?

লোকটা বলল, ভাইরাস আমি ছড়াইনি।

– আপনি রাত্রিবাস করার পরেই বাড়ির সকলে করোনা জ্বরে আক্রান্ত হয়, তারপর ওই পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে সেই জ্বর ছড়িয়ে পড়ে, তারপর পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, কনটেনমেন্ট জোন হয়ে যায় সেই অঞ্চল, মৃত্যু হয় অনেক, অক্সিজেনের হাহাকার পড়ে যায়, সকলের দম বন্ধ হয়ে আসে। কতটা ভাইরাস নিয়ে প্রবেশ করলে এমন হতে পারে?

এস এস বলল, আমার কোনো অসুখ ছিল না।

– ছিল, না হলে তাদের সকলের জ্বর এলো কীভাবে?

– আমি জানি না, আমার কোনো রোগলক্ষণ ছিল না, তারপরও আমার জ্বর হয়নি।

– সেই বাড়ির বৃদ্ধা মারা যান, তিনি তো ঘর থেকেই বেরোতেন না।

– অনেক এমন ঘটনা ঘটেছে দেশে।

– আপনি ভাইরাস লুকিয়ে ওদের বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন, মহামারির সময় তা চূড়ান্ত অপরাধ, আপনি ভাইরাস ছড়াতেই প্রবেশ করেছিলেন ওই বাড়িতে।

– আমি সব অভিযোগ অস্বীকার করছি। এস এস বলল।

– সেই চণ্ডীমাতা লেন থেকে পুরো এলাকা, তারপর কলকাতা আবার মহামারি প্লাবিত হয়।

– কলকাতায় তো মহামারি চলছিলই। এস এস মৃদুস্বরে বলল।

– না তখন কলকাতা সেফ জোনে পরিণত হয়েছিল, আপনি এসে আবার ভাইরাস ছড়িয়ে দিলেন।

– না, আমি এসেছিলাম সুলগ্নার ডাকে, সে বলেছিল আমাকে অনেকদিন দেখেনি, কলকাতায় যদি আসি, আমি যেন জানাই।

– আপনার তো ফিরে যাওয়ার কথা ছিল।

– ফিরতে পারিনি, বাস ছিল না, ট্রেনে খুব ভিড়, উঠতে পারিনি, মেয়েটি আমাকে যেতে দেয়নি, তখন ফেরি ধরে আমরা আহিরিটোলা গেলাম, মেয়েটির বাবা আশিস রায় ফোনে ডেকেছিলেন, 'চলে আসুন, পুরনো গান শোনাব।'

– শুনেছিলেন গান?

– হ্যাঁ, রেয়ার রেকর্ড সংগ্রহ আছে ওঁর, কত রাত অবধি গান শুনলাম, সেই সব গায়ক-গায়িকার নাম কেউ মনে রাখিনি আমরা।

– সকলেই কি জেগে গান শুনছিল?

– হ্যাঁ, শুধু বৃদ্ধা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, গানের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছিল বাবা আর মেয়ে, বাবা থামলে মেয়ে, মেয়ের কণ্ঠে সুর ছিল।

– আপনি চলে গেলেন, মহামারির সময়ে কেউ কারো বাড়ি যায় না, নিষেধ রয়েছে তা আপনি জানতেন না?

– তারাও কি জানত না, আমাকে জোর করে নিয়ে গেল, না হলে স্টেশনে রাত কাটিয়ে দিতাম।

– আপনি ভাইরাস নিয়ে ঘুরছেন তা কি সত্যিই আপনার জানা ছিল না?

– আমার ভেতরে ভাইরাস আছে তা আমি জানব কীভাবে, কেউ কখনো বলেনি, আমি একটি মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে মার খেয়ে হাসপাতালে ছিলাম তিন মাস, পুলিশ রিপোর্ট দেখুন, আপনাদের হাসপাতাল কিংবা পুলিশ আমার ভেতরে ভাইরাস ঢুকিয়ে দিতে পারে, আমি পাল্টা বলছি।

– দুষ্কৃতি ধরা পড়েছিল?

– না, কেউ সাক্ষী দেয়নি, মাস্তানরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এস এস হাত নাড়তে লাগল, কেউ না, মাস্তানরা আমাকে ভয় দেখায়, ফারদার কিছু হলে মেরেই ফেলে দেবে।

– সেই মেয়ে সাক্ষ্য দেয়নি?

– না, তারা বর্ধমানের দিকে চলে গিয়েছিল, তখন মগরা, চুঁচুড়ায় কোভিড স্প্রেড করছিল ধীরে ধীরে।

– বুঝলাম, এর মানে আপনি যে ভাইরাস বহন করতেন না তা বলা যায় না।

– কী খারাপ দিন গেছে আমাদের স্বজন। পাড়ার মানুষ এখনো বলে, আমাদের থেকে ছড়িয়েছিল। আমার থেকে ছড়িয়েছিল। আমিই তো বেরোই। লোকটা বলল, আমাকে না নিয়ে যেতে পারতে।

– তা কী হয়, তুমি তো ভগবান হয়ে এসেছিলে আমাদের কাছে, টাকার ব্যাগটা ফেরত এনেছিলে, মান বেঁচেছিল বাবার। বলে চুপ করে গেল মেয়ে ধীরে ধীরে। বিষণ্ন মুখ দূরে তাকিয়ে থাকল।

লোকটা চুপ করে থাকে। মেয়েটি ঘড়ি দেখে। বিকেল হয়ে গেছে। মেয়েটা বলল, এবার যেতে হবে যে স্বজন বন্ধু।

আমি যদি ট্রেন না পাই? এস এস বলল।

আজ তো বাসে ফিরবে বলেছো। সুলগ্না বলল।

বাস ওদিকে নেই, আমি দেখি। বলতে বলতে লোকটা নেমে যেতে লাগল, ললিত তাকে অনুসরণ করতে লাগল। বিকেলে রাস্তায় লোক অনেক। লোকটা সেই অনেক লোকের ভেতর মিশে গেল। ললিত তাকে সহজেই হারিয়ে ফেলল। কিন্তু একটু পরেই দেখতে পেল, ওই যে সেই মেয়েটা, সুলগ্না অটোয় উঠছে শিবশম্ভুর সঙ্গে। অটো মুহূর্তেই চলে গেল শোভাবাজারের দিকে। ললিত ফিরল উবার ধরে। উবারের ড্রাইভার কথা বলে না। পাসওয়ার্ড জেনে নিয়ে জিপিএস অনুসরণ করে সারদা কলোনির দিকে ছুটল।

বাড়ি ফেরার পর ললিত ভাবছিল কথাগুলো কণিকাকে বলবে কি না। সেই লোকটি কণিকার সেই ভগবান, এস এস পাঁচ বছর বাদে অভিযুক্ত হবে করোনা জ্বর ছড়িয়ে দেওয়ার কারণে। সে-ই নাকি ভাইরাসের বাহক। যেমন রুকসানা। ললিত ভেবে নিচ্ছিল, কীভাবে আরম্ভ করবে কথাটা। একটি কথার সূত্রপাত ঘটানোই সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে। ললিত ব্যালকনিতে বসেছিল। বাতাসে আমের মঞ্জরির গন্ধ ভেসে আসছিল। বসন্ত এসে গেছে। তার বাগানের গাছে বৌল এসেছে। রুকসানার স্বামীকে ডাকতে হবে বাগান পরিচর্যার জন্য। ললিত পারবে না এই বাড়ি ছেড়ে যেতে। তখনই ফোন বাজল, হ্যালো স্যার।

তোমাকে দেখলাম উইদ এস এস।

আপনি এস এস, শিবশম্ভুকে দেখেছেন তো স্যার, এবার আমাদের কথায় সায় দিন।

তুমি ও সে কি রিয়েল? ললিত জিজ্ঞেস করল।

কেন স্যার, চোখে দেখেছেন, ফেক হতে পারে।

ললিত বলল, আমি এই দুপুরকে বিশ্বাস করি না, চোখে ভুল দেখতে পারি, সবই মিথ্যা।

সুলগ্না টেককেয়ার এজেন্সির কোনো ফেক ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বা পেজ নেই স্যার, যা দেখেছেন সত্যি।

না, সত্যি না, আসলে আমি কিছুই দেখিনি। ললিত বলল, সবটা ভেবেছি নদীঘাটে বসে।

হতে পারে না, আপনি মিথ্যে বলছেন। বলল সুলগ্না।

না, তুমি একজনকে হাজির করালে, সে আসলে সে নয়। ললিত বলল।

আপনি ভুল বলছেন, একজন লোককে খুঁজে বের করা আমাদের মতো এজেন্সির কাছে কিছুই না, আপনাকে দেওয়া কথা আমরা রেখেছি, এখন আপনি আমাদের কন্ট্রোলে আসুন, রিভার ফেসিং সাউথ ওপেন ফ্ল্যাট আপনাদের জন্য রেখে দেওয়া আছে, আপনার বাড়ির কথা ভাববেন না, সব আমাদের দায়িত্বে থাকবে, বাগানে আঙুরলতাও বসিয়ে দেব, যা আপনি চান, তাই, কিন্তু বাগানসমেত বাড়ি আমাদের, আপনাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আমরা দেখব, বৎসরান্তে হিসাব পাবেন, আপনাদের ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার, টি কফি বিস্কিট, ওয়াইন, হুইস্কি সব আমরা দেব, কেয়ার নেব আমরা, আমরাই আপনাদের চিকিৎসা করাব …।

ললিত বলল, আমি তোমাদের এজেন্সিকে ফেক এজেন্সি মনে করি, আমাদের বাগানে আমগাছে বৌল ধরেছে, নিমগাছে ফুল ফুটেছে, বসন্ত এসে গেছে, আমি থাকব না তা তো হয় না সুলগ্না, তোমার সাজানো দৃশ্য সব মিলিয়ে যাচ্ছে কুয়াশার মতো করে, রাখলাম।

ললিত ললিত, সুজন স্বজন, ভালো মানুষ, লাল্লি ম্যান, হাই সেক্সি, প্লিজ ... কথা সম্পূর্ণ না হতে ললিত ফোন কেটে দিলো।

তখন সারদা কলোনি থেকে অ্যাম্বুলেন্স বেরিয়ে যাচ্ছিল তীব্র সাইরেন বাজিয়ে। কেউ একজন অসুস্থ হয়েছে। কে? অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকে। কণিকা বলল, সেই বাড়িতে এসেছিল অ্যাম্বুলেন্স।

কোন বাড়ি? জিজ্ঞেস করল ললিত।

কণিকা বলল, সেই বাড়ি, কিন্তু আমি চাই না কোনো বাড়িতে অ্যাম্বুলেন্স আসুক।

তুমি কোন বাড়ির কথা বলছ, প্রকাশ ঝাঁ, নীলম, ওদের বাড়ি যজ্ঞ হলো কোভিড তাড়াতে, অনেক লোক এসেছিল বলে, হিমালয়ের সাধু পর্যন্ত, সাধুর কাজ হয়েছে হোম যজ্ঞ করে কোভিড তাড়ানো।

এর মানে কী?

জানি না, জিতেনের কবিতা।

কণিকা বলল, যজ্ঞের দিনই নীলমের জ্বর, ফুটফুটে মেয়েটাকে বহুদিন রোগে ধরেছিল, লুকিয়ে ছিল সেই রোগ, তারপর ফুটে উঠল জ্বরে, আহা রে মেয়েটা যেন হাসতে হাসতে ফেরে।

একই কথা বলতে লাগল কণিকা। কথার  ভেতরে আমের বৌলের গন্ধ নিমফুলের গন্ধ মিশে যেতে লাগল। ললিত ফোন করতে লাগল গৌতমকে। সকলে ঠিক আছে গৌতম, কেউ কাউকে হত্যা করেনি তো, কেউ জ্বরে শ্বাস নিতে পারছে না, এমন হয়নি তো? ফেক নিউজে সাবধান, আর কোনো খারাপ খবর আসেনি তো? অ্যাম্বুলেন্সের আর্তনাদ শুনছো না তো? ললিতের মনে পড়ল জিতেন্দ্রচন্দ্র মহত্তম রায়ের কথা। কতদিন তার কবিতা আসে না, সেই সব অপার্থিব কবিতা, ধূসর নীল নিটোল চৌকো, ভেসে যায় ভোরের নৌকো। তখন ভোরটা ছিল সুন্দর। এখন সুন্দর-অসুন্দর কিছুই নয়। ললিত পাঠ করতে থাকে মনে মনে, ধূসর নীল নিটোল চৌকো, সারপেন্টাইন লেনে আসে ভোরের নৌকো।

**Tags** অমর মিত্র ধূসর নীল ভোরের নৌকো

**Share**

## Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

বাড়ি ৪২ , রোড ২৭ , ধানমন্ডি
শেখ কামাল সরনি , ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮০ ২ ৪১০২০৮২৩, ০২ ৪১০২০৮২৪, ০৯৬১৩ ০২০৮২৫

প্রকাশক: আবুল খায়ের
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সম্পাদক: সুব্রত বড়ুয়া
সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য: রুবী রহমান, লুভা নাহিদ চৌধুরী
© সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত